সাধনা

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

১৩০১-১৩০২ সাল।

আগে চল্ আগে চল ভাই !
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই !
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

([illegible] হইতে ১৩০২ [illegible] পর্য্যন্ত)

সাধনা ।

সাধনা ।

দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন খানি ।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি ।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি ।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি ।
ওগো, ব্যর্থ সাধন খানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী ।

তুমি যদি দেবি পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখি জল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধন খানি।

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্ন তন্ত্রী বীণা!
ওগো ছিন্ন তন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।

সাধনা।

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা!
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।

ওগো বিফল বাসনা রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা রাশি!

৪ কার্ত্তিক।
১৩০১।

প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দ্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহা-দেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত"। যাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই! তাঁহারা একটা কিছু হইলে

হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু একটা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোন বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইলেন না এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল তিনি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস, চাকরীতে প্রবিষ্ট হইলে যে-কোন ডিপার্টমেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন,—তিনি কোন চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তিসুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল—বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে-গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী, যে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোন সন্দেহ ছিল না এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ব্ব পাছে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্ত্ত্যলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল পরীক্ষা দিলেন না এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন "পরীক্ষাটা দিলেই ভাল হ'ত!"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি? আমাদের কেদারও ত পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দ্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কি আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানী পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অকারণে মনে করিল কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এই জন্য সখীর উল্লাসে

উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল, যে, এল্, এ, পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি, বিলাতের কোন কালেজে বি, এ,র নীচে পরীক্ষাই নাই।—বলা বাহুল্য এ সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরম প্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য এই জন্য মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে এক বিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল আমরা ত ভাই বিলাতেও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোথায় পাইব! মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলেকে কালেজে এল, এ, দিতে হয়; —তাও ত ভাই সকলে পারে না। অত্যন্ত নিরীহ সুমিষ্ট এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল। কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষ্যে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই বাবু বাহিরের যে বড় বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নবঅভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামা বাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বুঝিল এরূপ স্থলে সর্ব্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মত লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না এই জন্য সে তাহার পিতা মাতার প্রতি কোন দোষারোপ করিল না সে বুঝিল ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক কিন্তু এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চল; আমি আর এখানে থাকিবনা।

অনাথবন্ধুর মনে অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি যদি না যাও ত আমি একলাই যাইব।

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাই-

বার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীর মুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল—না, সে হইতে পারিবে না! তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতা মাতার সন্দেহ হইল, যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমাদের কোন অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে? বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড় সুখে বড় আদরে আমার দিন গিয়াছে!—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল। বাপ মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর ঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড় মানুষের ঘরের দাসী প্রতি-

মুহূর্ত্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শ্বাশুড়ি স্নেহবশতঃ বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্ন মুখে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া শ্বাশুড়ির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল এবং পল্লিরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্ব-নিয়ম নীতিবোধ প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপ-দেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় সয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভাল কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমত বিশুদ্ধ ভাল ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোট এবং একটি বড় ভাই ছিল। বড় ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জন করিতেন তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোট দুটি ভাইয়ের বিদ্যা-শিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসা-রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন অসম্ভব কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন এই জন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণটুকু

কে যেন কসিয়া আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড় বৌ মনে করিল, মেজবৌ বড় ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হৌক্, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লিতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দশ বিশ জন স্কুলের ছাত্র জড় করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোন কোন ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদ দাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন কিন্তু দরিদ্র সংসারে এক পয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোন চাক্‌রি লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্ব্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাক্‌রী আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙ্গালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝযা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা গরীব মানুষ, বড় মানুষের মেয়ে এবং বড় মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া? সেখানে ত বেশ ছিলেন কোন দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে?

শাশুড়ি বড়বৌকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন

করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজবৌও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডাল ভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্য ঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতিরাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, তোমার একটা চাক্‌রির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কি করিয়া ?

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড় লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুর বাড়িতে দীন-হীনের মত নত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম্মপত্নী, যে, তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জ্জয় অভিমানের সঞ্চার

হইল এবং সংসারের ও সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল!

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন ইহাকে আর কোন কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোন প্রকারে ঘরে টিঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন. অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, আজকাল বিলাতে না গেলে কোন ভদ্র চাকরী পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোন ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।

এক ত বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কি করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহঙ্কারে বাধা দিল অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্ম্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমনি করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল।

অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্ত্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাবু বহু-

সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড় শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন্ শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল কিন্তু ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুইসখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্ব্বক বাহির হইতে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার স্বামী কখন্ উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলোযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোন একটি চোর এই কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকে! বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে, সেখানকার খরচ পত্র চালাইবার অন্য কোন উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গত রাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুবা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে, প্রাঙ্গন হইতে, প্রতিবেশিদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

শরতের উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়ন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল্ মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি;

তোরা এখন যা!" তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন,—"বিন্দু, কি হয়েছে মা—এখনো দ্বার বন্ধ কেন!" বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস!

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, বাবা, আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্ধুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।

তাঁহারা অবাক্ হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের কাছে চাহিস্ নাই কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও!

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃ সম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্য্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মত লুণ্ঠিত হইতে

লাগিল। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্ব্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন, কমল এবং আরো অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাস দাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্ত্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্ট বুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দগৃহে পূজার উৎসব কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শ্বাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শ্বাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, শ্বাশুড়ি দরিদ্র, আমিও দরিদ্র, আমরা এক

দুঃখবন্ধনে বদ্ধ; পিতামাতা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে। একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে!

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল, এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিরূপগুণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজ কন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য, সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত এমত অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোন অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ইহাতে বিচিত্র নাই।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনটন হইল, তখন এই নিরুপায় বাঙ্গালীর মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙ্গালীর মেয়েই দুই হাতে কেবল দুই গাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চুড়ি, বেনারসি সাড়ি এবং শাল পর্য্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্ব্বক মাথার দিব্য দিয়া, অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাট করিয়া দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যাণ্ট্‌লুন্‌ পরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং হোটেলে আশ্রয় লই-লেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব, প্রথমতঃ উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়তঃ পল্লিবাসী দরিদ্রগৃহস্থ জাতিনষ্ট হইলে একেবারে নিরু-পায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু; তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। দুইটি শোকার্ত্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিষ্টরী কীর্ত্তিতে তাহাদের মনে গর্ব্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ, অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহঙ্কার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্ব্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, আজকাল ঢের লোক ত সাহেব হয় কিন্তু এমন ত কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতী সাহেব! বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই!

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল, যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর

স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবন-তন্ত্রী ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সঙ্কটসঙ্কুল জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিবিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার ষ্টীমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় কবিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই!"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে সকল বাব্‌-লাইব্রেরী-বিহারী স্বদেশীয় বারিষ্টরগণ তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ .করে না এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন—সমাজ

যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্য্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতি চাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতী সমাজের গালে কালি এবং হিন্দু সমাজের গালে চূণ লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুসী হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতী সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃত ভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থ ব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্য্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্ম্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্ল মুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার

স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদঘাটন পূর্ব্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্ব দর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধ-স্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে উন্নত মস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু স্নানে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্ত্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম-উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিত সভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল "এক সাহেবলোগ্‌কো মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথ বন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা, আরক্তকপোলা, আতাম্র-কুন্তলা, আনীললোচনা, দুগ্ধফেনশুভ্রা, হরিণলঘুগামিনী ইংরাজ মহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইংরাজ মহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সে দিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

পঞ্জিকার ভ্রম।

ক্রান্তিপাত ও মন্দোচ্চের গতি।

সমতল টেবিলের উপর একটি লাটিম ঘুরাইয়া দিলে লাটিমটি তাহার ধ্রুবরেখার * চারিদিকে দ্রুতবেগে ঘুরে, কিন্তু ধ্রুবরেখাটি অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী শলাকাটি ঠিক ঊর্দ্ধাধোভাবে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কখন কখন দেখা যায়, শলাকাটি স্থির না থাকিয়া ঈষৎ হেলিয়া ধীরগতিতে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর পক্ষেও ঠিক্ এইরূপ। পৃথিবীর ধ্রুবরেখাও ঠিক স্থির না থাকিয়া ধীর গতিতে একটি বৃত্তাকার পথে প্রায় ২৫০০০ বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে। আজ যে স্থির নক্ষত্রের অভিমুখে পৃথিবীর ধ্রুবরেখা লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে, কয়েক শত বৎসর পরে আর ঠিক সে নক্ষত্রের অভিমুখে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে না। সুতরাং আজ যে নক্ষত্রকে আমরা ধ্রুব তারা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কয়েক শত বৎসর পরে আর তাহার ধ্রুবত্ব থাকিবে না। আবার পঁচিশহাজার বৎসর পরে সে ধ্রুবত্ব লাভ করিবে।

পৃথিবী যদি সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার হইত, যদি তাহার মেরুপ্রদেশ চাপা ও নিরক্ষদেশ স্ফীত না হইত, তাহা হইলে এই ধ্রুবরেখার গতি ঘটিত না; ধ্রুবতারা চিরদিনই ধ্রুবতারা থাকিত। ক্রান্তিপাতের গতি অথবা অয়নচলের সম্ভাবনা থাকিত না। জ্যোতির্ব্বিদগণের দুর্ভাগ্যবশে পৃথিবীর ধ্রুবরেখা চিরকাল একমুখে না থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘুরে। তাই এই গোলযোগের উৎপত্তি।

অয়নচলন ব্যতীত আর একটা গতির উল্লেখ করা আবশ্যক।

---

* ধ্রুবরেখা অর্থে axis of rotation.

ক্রান্তিপাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে চলে ; কিন্তু মন্দোচ্চস্থল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে চলে। সূর্য্যের পথ (অথবা পৃথিবীর পথ) ঠিক বৃত্তাকার নহে, সেই জন্য পৃথিবী সর্ব্বদা সূর্য্য হইতে সমান দূরে থাকে না। যে স্থানে দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই স্থলের নাম মন্দোচ্চ। ইহার ইংরাজি নাম apogee। সূর্য্য কখন একটু বেশী দূরে যায়, কখন একটু নিকটে আসে সেই জন্য সূর্য্যের মণ্ডল কখন একটু ছোট দেখায়, কখন একটু বড় দেখায়। সংবৎসরের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কখন একটু বড় কখন একটু ছোট দেখায়। এই ইতরবিশেষ এত সামান্য, যে সহজ চোখে ধরা পড়ে না। যন্ত্রযোগে সহজেই ধরা পড়ে। যেমনেই হউক এই ইতরবিশেষটুকু মাপিতে পারিলেই সূর্য্যের ন্যূনতম ও অধিকতম দূরত্বের মধ্যে কত তফাত জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের পথ বৃত্ত হইতে কত তফাত তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কোন্ সময়ে কতবড় দেখায়, অর্থাৎ কোন্ সময়ে আকাশ মণ্ডলের কতটুকু জায়গা লইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে পরিমাণের প্রয়োজন। আজকাল অবশ্য যন্ত্র সহকারে এই পরিমাণ সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালে সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না ; অন্য উপায় অবলম্বিত হইত।

মনে কর আজ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কত বড় দেখায়, অর্থাৎ আকাশ মণ্ডলে কত ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, বাহির করিতে হইবে। প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘড়ী লইয়া খোলা মাঠে অথবা উঁচু ছাদের উপর বসিয়া থাক। ঠিক্ কোন্ সময়ে সূর্য্যমণ্ডলের এক প্রান্ত, অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্ত, চক্রবাল রেখায় দেখা দিল, স্থির কর। তার পর কতক্ষণ পরে সূর্য্যমণ্ডলের অপর প্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রান্ত, চক্রবালে দেখা দিল, অর্থাৎ কি না, ঠিক্ সমগ্র মণ্ডলটি উদিত হইল, তাহা স্থির কর। এই সময়টুকু সমগ্রমণ্ডলের উদয় কাল।

এই সময়টুকু স্থির হইলেই ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিতে আর বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনহেতু সূর্য্যমণ্ডল প্রায় ৬০ দণ্ডে সমগ্র আকাশমণ্ডলটা অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি পরিমিত স্থান ঘুরিয়া আসে। ঠিক ৬০ দণ্ডে নহে; কোন দিন একটু অধিক সময়ে কোন দিন একটু অল্প সময়ে। যাহাই হউক, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে কতটুকু সময় আবশ্যক জানা থাকিলেই, সমগ্র মণ্ডলের উদয়কালে কত ডিগ্রি গতি হইয়াছে জানা যায়। সেইটাই সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাসের পরিমাণ। এই ব্যাসের পরিমাণ প্রায় বত্রিশ কলা, অর্থাৎ আধ ডিগ্রির কিছু অধিক।

আজ কাল সূর্য্যের দূরত্ব পয়লা জুলাই তারিখে, অথাৎ পূরা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সব চেয়ে অধিক হয়; সেই সময় সূর্য্য মন্দোচ্চে থাকে তখন সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস প্রায় ৩১৷৷০ কলা পরিমিত দেখায়। আর ৩১সে ডিসেম্বর তারিখে অথাৎ প্রবল শীতের মাঝামাঝি, সূর্য্যের দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়; তখন সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; ব্যাস ৩২৷৷০ কলার একটু অধিক দেখায়।

১লা জুলাই তারিখে ৩১৷৷০ কলা, আর ছয় মাস পরে ৩১সে ডিসেম্বর তারিখে প্রায় ৩২৷৷০ কলায় এক কলার তফাত; পৃথিবীর পথ ঠিক বৃত্তাকার হইলে, আর সূর্য্য তাহার কেন্দ্রবর্ত্তী থাকিলে এই তফাতটুকু ঘটিত না। পথ বৃত্তাকার নহে আর সূর্য্যও ঠিক কেন্দ্রবর্ত্তী নাই, একটু একপাশ ঘেঁষিয়া আছে; সেই জন্য ছয় মাসের মধ্যে এই এক কলার তফাত। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যের দূরত্ব যদি ৩০ ধরা যায়; ১লা জুলাই তারিখে দূরত্ব ৩০এর বেশী, প্রায় ৩১ হইবে। মোট দূরত্ব প্রায় ৩০; আর সংবৎসরে দূরত্বের ব্যত্যয় প্রায় ১; অর্থাৎ সমগ্র দূরত্বের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এই ভগ্নাংশের ইংরাজি নাম Eccentricity। ইহার পরিমাণ

জানা থাকিলে সূর্য্যের গতি বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে কিরূপ হইবে, বাহির করা চলে।

আধুনিক মতে সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণ ৩২ কলা ; সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে ব্যাসের পরিমাণ ৩২ কলা ২৪ বিকলা ; কখন ইহার একটু বেশী ; কখন ইহার একটু কম। সূর্য্য সিদ্ধান্তে যে Eccentricity ধরা আছে তাহা আধুনিক মতানুযায়ী পরিমাণ হইতে একটু তফাত ; একটু অধিক। আধুনিক মতে যাহা ১১৫, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে তাহা ১৩০ ; অর্থাৎ প্রায় দুই আনা পরিমাণে অধিক। তবে এরূপ তফাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

সূর্য্য ১লা জুলাই তারিখে মন্দোচ্চ থাকে ; মন্দোচ্চ হইতে যত দূরে যায় ততই দূরত্ব একটু একটু কমে, দেখিতেও একটু একটু বড় হয়, যেহেতু একটু একটু বাড়ে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে কোন্ তারিখে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কতদূরে আছে না জানিলে সূর্য্যের গতিগণনা চলে না। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে এইরূপে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কতদূরে আছে, প্রথমে স্থির করিয়া, পরে সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থিতিস্থান নির্দ্ধারিত হইত। আধুনিক জ্যোতিষেও ঠিক সেই প্রণালীতে গণনা হইয়া থাকে। উভয়ের প্রণালীগত কোন বিভেদ নাই।* কিন্তু এইখানে একটু সাবধান হইতে হয়। সূর্য্যের পথের মন্দোচ্চ স্থান ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। আজকাল ১লা জুলাই তারিখে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থাকে কিছু দিন পরে আর ঠিক ১লা জুলাই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইবে না, কিছু পরে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ

---

* মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা সৌরজগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগণের গতি আজকাল যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত নির্দ্ধারিত হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না।

পশ্চিমে সরিতেছে। মন্দোচ্চও তেমনি ক্রমশ পূর্ব্বমুখে সরিতেছে। সুতরাং বৎসর বৎসর মন্দোচ্চ কতটুকু করিয়া সরিতেছে না জানিলে গণনায় চিরকাল ঠিকফল পাওয়া যাইবে না। এই মন্দোচ্চের গতি নিরূপণ কিছু কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যখন সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্য না পাওয়া যায়; কেবলমাত্র সূর্য্যমণ্ডলের বিস্তার চোখে দেখিয়া পরিমাণ করিয়া নিরূপণ করিতে হয়। মন্দোচ্চ যে পূর্ব্ব-মুখে ক্রমশঃ সরিতেছে, তাহা প্রাচীনকালে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু এই গতির পরিমাণ নির্দ্ধারণে বড়ই ভুল ঘটিয়াছিল। প্রাচীন মতে ইহার পরিমাণ সংবৎসরে এক বিকলার প্রায় দশভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ১১ বিকলা। এই ভ্রম নিতান্ত কম নহে। এবং এই ভ্রমের দরুণ আমাদের পঞ্জিকার গণনার সহিত দৃষ্ট ফলের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এই ভ্রান্তিটুকু আমাদের পঞ্জিকার সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু সংশোধন করিবে কে? সংশোধন গ্রহণ করিতেই বা সাহসী কে?

ফলতঃ মন্দোচ্চের বার্ষিক গতির পরিমাণে এই ভ্রান্তিটুকু থাকিয়া আমাদের পঞ্জিকার গণনায় ও প্রকৃত ফলে বৎসর বৎসর তফাৎ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। তবে একটা কারণে তফাৎ যতটুকু দাঁড়ান উচিত ছিল অদ্যাপি ততটা দাঁড়াইতে পায় নাই। সেটাও অন্যদিকে আর একটা ভ্রমের দরুণ।

ক্রান্তিপাতের পশ্চিম মুখে গতি বৎসরে প্রায় ৫০।০ বিকলা; আর মন্দোচ্চের পূর্ব্বমুখে গতি বৎসরে প্রায় ১১।০ বিকলা; উভয় স্থল প্রতি বৎসর প্রায় ৬১॥ বিকলা হিসাবে পরস্পর হইতে সরিয়া যাইতেছে। এখনি সংবৎসরে শীতার্দ্ধ গ্রীষ্মার্দ্ধের চেয়ে সাত দিন কম; এই গতিপ্রযুক্ত কালে শীতার্দ্ধ আরও ছোট হইবে। আমাদের পঞ্জিকায় মন্দোচ্চের বার্ষিক গতি বৎসামান্য, কিন্তু ক্রান্তিপাতের

গতি ৫৪ বিকলা ধরা হয়। সুতরাং মোটের উপর বৎসরে ৭৷৷০ বিকলা ভুল পড়িয়া যাইতেছে। মন্দোচ্চের গতি আমরা প্রকৃত অপেক্ষা কম ধরি, আর ক্রান্তিপাতের গতি প্রকৃতের অপেক্ষা কিছু বেশী ধরি। একটা ভুলে আর একটা ভুল কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত হইতেছে।

সুবিচারের অধিকার।

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়ত তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দু সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোন কালে কোন বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোন বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেণ্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্ অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোন এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয় রক্ষা করিতে গিয়া কোনটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চির নিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটি মাত্র সামান্য বাদ্যযোগে কোনমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন

কিনা জানিনা, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবর্‌দস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহা-সমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর কোন প্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরাজ হিন্দুমুসলমানবিরোধব্যাধির যদি সেই রূপ আদিম প্রণালী মতে চিকিৎসা সুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান্, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ডল্যান্সডাউন্ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ডহ্যারিস্ পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যা-

বাদী। ইংরাজ গবর্মেণ্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কন্‌গ্রেসের প্রতি গবর্মেণ্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কন্‌গ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভাল, কিন্তু তাহা গবর্মেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্মেণ্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ

বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোন-কালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি, গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকারই সম্ভব কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোন প্রকার অসাধু অভিপ্রায় না থাকিতে পারে তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গ-লোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে সকল খবর লড্ ল্যান্স্ডাউন্ এবং লর্ড্ হ্যারিস্ জানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলোযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্ত্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকী আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল ষ্টেট্স্-

ম্যান্ পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ উপাধিধারী কোন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরাজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয়, যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে "ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানো"-রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বৌ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচার কার্য্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে, শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলিনা যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্য্যবিধি স্বভাবত, এমন কি, অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তি-

কাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেণ্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট্ যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্য স্বাধীনভাবে সমালোচন করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য্য হইতেছি এবং ইংলণ্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরাজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরাজ এতদূর পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে, যে, ভারত-রাজ্যতন্ত্রের বড় বড় ভূধর-শিখর হইতেও রাজনীতি-সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয় স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপরপক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরাজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্মেণ্টের ইহাতে কোন হাত নাই!

কেবল ইহাই নহে। কন্‌গ্রেস্ অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরাজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনও একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেইসূত্রে যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরাজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিতক্ষেত্রে

কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাত সহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরাজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীত চিত্তে একটা রাজনৈতিক সঙ্কট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় "ইংরাজের আতঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে—গবর্মেণ্ট নামক যন্ত্রটি যেমনি নিরপেক্ষ থাক গবর্মেণ্টের ছোটবড় যন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারম্বার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এখনো প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই ;—ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্মেণ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার আবশ্যক কি ছিল ?

গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোন আবশ্যক নাই সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্দ্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকেও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

(দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই।) কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড় কঠিন।

(কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কি করিয়া? যাহারা বারম্বার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোন কালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে?) ইংরাজ যে আমাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরাজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুবআশ্রয় ভূমি হইয়া

উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভগ্নপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

অতএব বাঁধ বাঁধিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি নির্ভীক অন্যায়-অসহিষ্ণু আত্মবিসর্জ্জনপর মহাদাশয় লোকের আবশ্যক। তাঁহারা এক একটি বনস্পতির ন্যায় আপন অমোঘ মূলজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের শিথিল মৃত্তিকাকে দৃঢ়বলে আঁটিয়া ধরিবেন। সমস্ত জাতিকে অটল করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি লোককে একলা দাঁড়াইতে হইবে—খ্যাতি এবং কৃতজ্ঞতা তাঁহারা প্রত্যাশা করিবেন না—পরজাতির নিকট হইতে উপহাস ও উৎপীড়ন এবং স্বজাতির নিকট হইতে অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহ বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশতঃ আমাদের মধ্যে দুই চারিজন লোকও যখন শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত

হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজ্যতন্ত্র যতই উন্নত হউক্ প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ, মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্ততঃ কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরাজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

স্বরলিপি।

রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল একতালা।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ!
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি
পদে পদে অপমান।

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান!
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান!

(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্কপসরা
যেও না পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।

২।৩

১ ২ ৩

॥ না র্সা -নর্সর্রা। র্সা ঞ্ধা পা। মা ঙ্গরা সা।
॥ ত বু —। পা রি নে। স পি তে।

০ ১ ॥

। ন্সরা -া -া। -া -া া। সসা -া ন্সরা। রা রা রা।
। প্রা — —। — ণ্ । পলে — প। লে ম রি।

। মমা -া ঙ্গরা। সা -া গমা। পা র্সা না।
। সেও — ভা। ল — সহি। প দে প।

। নর্সর্রা র্সা ঞ্ধা। পা -া -া॥ সসা -া ন্সরা।
। দে অ প। মা — ন্॥ কথা — -র।

। রা রা রা। রা মা ঙ্গমঙ্গা। -া রা সা। পা পধঞ্রা ঞ্ধা।
। বাঁ ধু নী। কাঁ দু নী। -র্ পা লা। চো খে না।

। পধপা মা গমা। রগ মা -া -া। -া -া া। পা না না।
। হি কা রো। নী — —। — র্। আ বে দ।

। না র্সা -া। ননা -র্রা র্সা। ঞ্ধা পা মগমা।
। ন আ র্। নিবে — দ। নের্ থা লা।

। পপা -র্সা ঞ্ধা। পধপা মা গমা। রগমা -া -া।
। বহে — ব। হে ন ত। শি — —।

। -া -া া। না না .না। ননা -া ঃ-র্সঃ। র্সর্সা -নর্সর্রা র্রর্সা।
। — ব্ —। কাঁ দি য়ে। সোহা — গ্। ছিছি — এ।

। র্সা র্সা -া । পা র্সনা র্সা। -া র্রা র্রর্সা। র্রর্মজ্ঞা ঃ-র্রঃ র্সর্রা।
। কি লা -জ্। জ গ তে। -র্ মা ঝে। ভিখা — রী।

। র্সা র্সর্রর্সা না। পা না না। র্সা র্সা র্সা। ঞ্ধা র্সা ঞ্র্সঞ্ধা।
। র সা জ্। আ প নি। ক রি নে। আ প না ।

। ধপা পা ধা। ঞ্র্সা -া ঞ্ধা। পধপা মা গমা।
। -র্ কা জ্। পরের্— প । রে অ ভি।

। রগমা -া -া॥ সসা -ন্সরা রা। রা রা -া। রপা -া মা।
। মা —ন্॥ আপ — নি। না মা ও। কল — ঙ্ক।

। জ্ঞমজ্ঞাঃ -রঃ সা। পা পধঞ্ধা ঞ্ধা। পধপা মা গমা।
। প -স রা। যে ও না । প রে র ।

। রগমা -া -া। -া -া া। পনা -া পা। না র্সা র্সা।
। দ্বা — —। — র্ । পরে -র্ পা। য়ে ধ রে।

। র্সর্রর্সা -া ঞ্ধা। পা মগা মা। পর্সা -া ঞ্ধা।
। মা -ন্ ভি । ক্ষা ক রা। সক — ল ।

প
। পধপা মা গমা। রগমা -া -া। -া -া া। না -া না।
। ভি ক্ষা র । ছা — —। — র্ । দা ও দা।

। -া না না। র্সর্সা -া র্সা। র্সাঃ -র্সঃ র্সা।
। ও ব লে। পরে -র্ পি। ছু পি ছু।

। পর্সা -া না। র্সা র্রা র্রর্সা। র্র ম জ্ঞা ম জ্ঞা।
। কাঁদি — য়া। বে ড়া লে । মে লে না।
গ

। ঙ্ র্রা ^স^র্রা র্সনা। পা-না না। র্সা র্সা -া। নর্সর্রা -র্সা ঞধা।
। ত কি ছু । মা - ন্পে। তে চা ও। প্রা -ণ্ পে ।

। পা মগা মা । পধা -ঞর্সা ঞধা । পধপা মা গমা ।
। তে চা ও । প্রা ণ্ আ । গে ক র ।

। রগমা -া -া ॥
। দা — -ন্ ॥

ব্যাখ্যা।

১। তালের খাতিরে এই গানের কতকগুলি কথা, গাহিবার সময় ছাড়িয়া দিতে হয়। তাই, স্বরলিপিতে সেই কথাগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। পার্শ্বস্থ যুগলচ্ছেদ অ'স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া যেখানে শিরোদেশে যুগলচ্ছেদ দেখিবে, সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরা ধরিবে।

৩। এই গানের আরম্ভেই প্রথম তালি পড়ে। "পারি নে"—ইহার মধ্যে "পা" শব্দটির উপর দ্বিতীয় তালি সম্ পড়ে। তালি-সংখ্যার উপর রেফ্ চিহ্ন থাকিলে সমের স্থান বুঝায়।

৪। ঙ্ = কোমল গ ; ঞ = কোমল ন।

৫। । = এক মাত্রা ; ঃ = অর্দ্ধ মাত্রা। যে সুর কেবল ছুঁইয়া যায় মাত্র তাহাকে স্পর্শমাত্রার সুর কহে ; এই সুর, ছোট অক্ষরে, মূল সুরের গায়ে শিরোদেশে লিখিত হয়।

৬। আকার যখন কোন সুরের সহিত হাইফেনের দ্বারা যুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকে, তখন তাহাতে একমাত্রা কাল বিরাম বুঝায়। অর্থাৎ সে স্থলে একমাত্রা কাল থামিয়া থাকিতে হয়।

বোম্বায়ের রাজপথ।

নাট্যশালা রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপট বাদ্যভাণ্ড সমস্তই আধুনিক হইতে পারে কিন্তু তথাপি যখন শকুন্তলার অভিনয় দেখা যায় তখন কোথা হইতে সেই পুরাতন তপোবন, সেই চন্দ্রবংশীয় রাজার পুরাতন রাজপুরী, সেই অতীত প্রাচীন ভারতবর্ষ সমস্ত আধুনিকতাকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। বোম্বাই সহরটি দেখিলে সেইরূপ মনে হয় যে, এই নূতন নাট্যশালা ইংরাজের রচিত; ইংরাজ ইহাকে সুচিত্রিত করিয়াছে, ইংরাজ ইহার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছে এবং সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে ইংরাজী যন্ত্রে ইংরাজের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে; তথাপি সমস্ত অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে একটি সুকোমলা প্রাচ্যশ্রী দর্শকের চক্ষে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেছে।

সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাইপুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একখানি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেলতরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবনমধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে। রাজপথে বিচিত্র জনতা—এই মায়াপুরীরই রাজপথ—এবং সে জনতাও এমনি মোহকর। বিচিত্র উষ্ণীষ, বিবিধ বর্ণ, বহুবিধ বেশভূষা, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, সমস্ত মিলিয়া দর্শকের মনে একটি সুদূর স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেয়—এবং এই বিচিত্রবর্ণ গতিবিধি মৃদু সন্ধ্যারুণরাগে শুধু একটি বর্ণময়ী ছায়াসমাগমের মত প্রতিভাত হয়।

কলিকাতার নগ্নশির দীনবেশ কৃষ্ণকান্তি জনপ্রবাহ হইতে আসিয়া বোম্বায়ের এই বিচিত্র বর্ণতরঙ্গের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত প্রশ্ন করিয়া উঠে, এ সমস্ত সত্য কি স্বপ্ন, কায়া কি ছায়া, বাস্তব কি চিত্রার্পিত মাত্র। সমস্তই যেন অত্যন্ত প্রাচ্য এবং প্রাচীন উপন্যাসবর্ণিতবৎ।—অর্দ্ধাচ্ছাদিত কর্ণীরথে বসিয়া বণিককন্যাগণ সমস্বরে স্বদেশীয় গাথা গান করিতে করিতে চলিয়াছে—পরিধানে বিচিত্রচিত্রিত শাটিকা এবং চারু নীল পীত হরিৎ বর্ণের উজ্জ্বল বক্ষাবরণ। রথের দ্রুত গতিবশে গোকণ্ঠবিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-সকল রিণিরিণি ধ্বনিত হইতে থাকে এবং অন্যমনস্ক পথিকজনকে রথচক্রপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেয়। মস্তকে দুগ্ধভাণ্ড লইয়া সুগঠনা তন্বঙ্গী আহীরবালিকারা সরল অঙ্গযষ্টির অবলীলাগতিভঙ্গে সৌন্দর্য্যের একটি হিল্লোল তুলিয়া যায় এবং পিত্তল কঙ্কন মুহুর্মুহু কাংস্যভাণ্ডে আহত হইয়া পশ্চাতে একটি লঘু ধ্বনি সমুত্থিত করিয়া তুলে। নিরবগুণ্ঠনা মহারাষ্ট্রকুল-কামিনীগণ নিঃসঙ্কোচ অস্খলিতপদে রাজপথে ইতস্ততঃ গতায়াত করেন-পুষ্পমাল্যবিভূষিত কঠিনদৃঢ়বদ্ধ ব্রাহ্মণীয় বেণী মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কুণ্ডলিত হইয়া থাকে; যেন কোন্ পুরাতন ভাস্কর্য্য এই দক্ষিণ দেশে আসিয়া সহসা সজীব হইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। শাড়ীর বিচিত্র ভাঁজ, বিলম্বিত দৃঢ় কচ্ছ, বাম স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বাহূপরি বিলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্ত,ঈষৎ ব্যক্ত বক্ষসন্নদ্ধ চোলিকা—সকলই বিচিত্র; শুধু বর্ণ এবং আভা, ছায়া এবং আলোক, বসন ভূষণ এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্যের তরঙ্গ। এবং এই তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যমধ্যে শুভ্রবস্ত্র-নিবদ্ধকেশপাশ বিচিত্রাভ চীনাংশুকপরিহিতা পারসীক সুন্দরী-গণের মৃদুস্মিত স্নিগ্ধশোভা একটি নূতন রমণীয়তা সঞ্চার করি-য়াছে। ভারতবর্ষের সহস্র জাতি বর্ণ দ্বিকোণ চতুষ্কোণ গোলাকার

বক্রচূড় শুভ্র নীল পীত রক্ত বিবিধ উষ্ণীষরাজিতে শোভিত হইয়া এই চিত্রার্পিত জনতার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং কুবলয়-স্নিগ্ধদৃষ্টি কুলকামিনীগণ সমাগমে এই রমণীয় জনতা অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ভারতে এমন উজ্জ্বল সজীব অথচ ·চিত্রার্পিতবৎ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

বোম্বায়ের পার্শ্বে কলিকাতার চিত্রপট অত্যন্ত ম্লান—না আছে এ উষ্ণীষখচিত প্রাচ্য বৈচিত্র্য, না আছে এ কুলাঙ্গনাদৃষ্টিউজ্জ্বল চিত্তহারী বর্ণবিন্যাস। সৌন্দর্য্য সেখানে ইষ্টকস্তূপের মধ্যে অসূর্য্য-স্পশ্য এবং রাজপথ এই শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকারাজির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যহীন জনতাপ্রবাহ মাত্র।

কলিকাতারও দৃশ্যপট অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে সমস্ত অন্ধকার ছিল সেখানে এখন ক্বচিৎ কদাচিৎ দুইটি স্নেহনিস্যন্দিনী উজ্জ্বল দৃষ্টি দুর্ভাগ্য পথিকজনের অন্তরে মৃদু আশার সঞ্চার করে। রাজপথে রথবাতায়ন পূর্ব্বের ন্যায় আর নীরন্ধ্র অর্গলিত হয় না। এবং "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" দাম্পত্যের মধু-কলহের বাহিরে কদাচ শুনা যায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রভূমির সহিত তুলনায় এটুকু কিছুই নহে। সুদীর্ঘ মুসলমানশাসননিপীড়িত বাঙ্গলায় সমাজের যে অর্দ্ধাঙ্গ সকলপ্রকার সামাজিকতা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরিবারের মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্গোপন অন্তঃপুরে অন্তরিত হইয়াছে, স্বাধীন মহারাষ্ট্রভূমিতে সে অর্দ্ধাঙ্গ চিরদিন অপরার্দ্ধের সহচরীরূপে অভ্যাগতকে সমাদর করিয়াছে, যজ্ঞস্থলে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করিয়াছে, রণস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে আসন অটল রাখিয়াছে; সুতরাং তাহার সে সহজ শোভন সম্ভ্রম, সে সুদৃঢ়পদচারিণী অবলীলাগতি, সে নিরবগুণ্ঠন নিঃসঙ্কোচ লজ্জাশীলতা অন্তঃপুর-অন্ত-

রিত বঙ্গগৃহের বদ্ধাকাশে আশা করা যায় না। কলিকাতার দৃশ্যপটে ক্বচিৎ কদাচিৎ সন্ত্রস্তসকরুণদৃষ্টি বঙ্গকুললক্ষ্মী যেন ছায়ার মত ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতে চাহেন। নেপথ্যের চিরাভ্যস্ত অসূর্য্যম্পশ্য কক্ষ হইতে দিবালোকিত রঙ্গ-মঞ্চে সহস্র দৃষ্টির মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে সহজেই তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয়। বাহিরের সহস্র তীব্রদৃষ্টি যেন নিতান্ত নিদারুণ পরিহাসের মত সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। তিনি যেন ব্যাধানুসারিতা হরিণীর ন্যায় ভয়ে পথভ্রান্তা এবং লজ্জায় সঙ্কোচে একান্ত অভিভূতা।

বোম্বাইপুরী পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনতীর্থ। ভারতলক্ষ্মী এখানে পশ্চিম সমুদ্রের তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সমুদ্র পার হইয়া এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী উভয়েই এখানে উজ্জ্বল অম্লান লাবণ্যে উদ্ভাসিত। নগরী শোভা স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, কর্ম্মস্রোত নিত্য প্রবাহিত, রাজপথে লৌহবর্ম্মে রথ-চক্র নিরন্তর ঘর্ঘরিত; এবং এই বেগবান্ পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যপ্রবাহের মাঝখান দিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষের উজ্জ্বলবর্ণধারিণী শুচিশোভা তরণী-খানি সুন্দরভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সভ্যতাসঙ্গমের তীর্থতটবর্ত্তী বোম্বায়ের এই কুহক অন্যত্র দুর্লভ। ইহার মধ্যে যে একটি মোহকরী প্রাচীনতা আছে—ইহার জনতায়, উষ্ণীষে, উৎসব-আনন্দে যে প্রাচীন সভ্যতার সজীবতা অনুভূত হয়, আর্য্যাবর্ত্তের বড় বড় সহরে কোথাও এই প্রাচীন মোহটুকু নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে উদীয়মান শক্তি-প্রভাবে মহারাষ্ট্রীয়গণ অনতিকালপূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে ক্রমশঃ আপন প্রতাপ বিকীর্ণ করিতেছিল সেই উদ্যৎ শক্তির দীপ্তি আজ ভস্মাচ্ছন্ন

হইলেও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই শক্তি এবং সেই জ্যোতি মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দুসমাজকে সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্রের তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ একটি সজীব আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশীয় উপপ্লবে সমতল উত্তর ভারত বারম্বার প্লাবিত হইয়া নব নব স্তরপাতে মিশ্রতা লাভ করিয়াছে; মহারাষ্ট্রদেশ অপেক্ষাকৃত অক্ষুব্ধ ছিল; দিল্লি মহানগরীর প্রবল আবর্ত্তবেগ দাক্ষিণাত্যে ক্ষীণতর হইয়া প্রবেশ করিত। আর একটি কারণ এই যে, কালিদাস ও ভবভূতির অমর কাব্য দক্ষিণ ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য পুরাতন করিয়া রাখিয়াছে। তীর্থ বহু আছে, দেবধামের অন্ত নাই, বর্ষে বর্ষে বহু ব্যয়ে নানা স্থানে বহু উৎসব সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি কোথাও রাজপথের বিচিত্র জনতার মুখশ্রীতে একটি প্রাচীন সভ্যতা মুদ্রিত হইয়া গিয়া থাকে ত সে বোম্বায়ে। বোম্বাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের একখানি চারু চিত্র।

আমি বোম্বায়ের একটি মাত্র উৎসব দেখিয়াছি। তখন ভাদ্রপদ মাস, সমুদ্র বোম্বায়ের কূলে কূলে উছলিত, আকাশে ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র, এবং নবাগত শরৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি দিয়া মেঘে মেঘে নব নব আভা এবং বর্ণের লূতাতন্তু রচনা করে। এই মায়াচন্দ্রাতপতলে গণপতির মহোৎসব। সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ গণপতি শিবিকারোহণে, বাহকস্কন্ধে সমুদ্রবেলায় সমাগত। দেহের বর্ণে একটি অতি মৃদু গোলাপী আভা, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, কুণ্ডলীকৃতাগ্রভাগ দীর্ঘ শুণ্ড উদরপিণ্ডোপরি প্রায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, এবং এই গজগাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে জ্ঞানের সরল প্রশান্ত মহিমা অনতিউজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। সহস্র মশালের আলোক, ভক্তবৃন্দের উন্মত্ত অঙ্গভঙ্গীসহকারে নিরন্তর জয়দেবধ্বনি, ঘনঘন ঢক্কানিনাদ এবং

বৃহৎ লোকারণ্যসমুত্থিত মহাকলরব একত্র মিশিয়া এই সন্ধ্যাছায়ালীন সমুদ্রোপকূলে গণপতির উৎসব নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।—অজ্ঞান বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে বন্দনাগান গাহিয়া আবেগভরে করতালি দিতেছে, মশাল জ্বালিয়া ঢক্কানিনাদ করিয়া উৎসব ঘোষণা করিতেছে; জ্ঞান অটল গাম্ভীর্য্যে নিশ্চল স্তিমিত—চক্ষে পলক পড়ে না, অঙ্গ উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হয় না, বেদনা ভাষাহীন হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ এবং মুখশ্রী ভাবে সর্ব্বদাই বিকসিত।

এই গণেশউৎসব বোম্বাই নাট্যশালার একটি প্রধান দৃশ্য। অভিনয় অধিক নহে, কিন্তু এরূপ সুবৃহৎ জনতা কদাচ দেখা যায়। সে দিন সমুদ্রোপকূলে রাজপথে সমস্ত বোম্বাই সহর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং উন্মুক্ত প্রাসাদবাতায়নসকল হইতে কুলললনাগণের কুবলয়দৃষ্টি নিপতিত হইয়া এই উষ্ণীষখচিত বিবিধবেশ বর্ণবৈচিত্র্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। এবং একে একে যখন আলোক নিভিয়া আসে, প্রতিমাসকল সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়, জনতা সহস্র পথ দিয়া গৃহাভিমুখী হইতে থাকে, বোম্বায়ের বর্ষব্যাপী এক অঙ্কের অভিনয় যেন সমাপ্ত হইয়া আসে—একবার যেন ক্ষণকালের জন্য পটক্ষেপ হয়। এবং দর্শকের মনে কেবল এই বসনভূষণ বর্ণধ্বনি, এই আকাশ সমুদ্র এবং আকাশপটে মুদ্রিত শ্যাম শৈলশ্রেণী ও সমুদ্রগর্ভে প্রতিবিম্বিত চারু বোম্বাই সহর, এই কোলাহল কলরব উৎসব মোহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসে এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ুর মধ্যে একটি তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন বহুক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে।

কাব্যের তাৎপর্য্য।

(পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত)

সভার সভ্যগণ।

ক্ষিতি।

স্রোতস্বিনী (অপ্)

দীপ্তি (তেজ)

সমীরণ (মরুৎ)

ব্যোম

এবং সেক্রেটারি।

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, কচ-দেবযানীসংবাদ সম্বন্ধে ‍ৃমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা ‍করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু ‍র্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন তাই দীপ্তি অধীর হইয়া ‍লিয়া উঠিলেন, তুমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোন ‍তাৎপর্য্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ও ‍লেখাটা ভাল হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে কহিলাম, আর একটু ‍বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা ‍সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না, কারণ, লেখার দোষ থাকাও ‍যমন আশ্চর্য্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্ব্বতাও ‍নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, যদিও নিজের ‍চনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে ‍থাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ

আছে—অপর পক্ষে সমালোচক সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মত হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য—হয়ত তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গম্ভীর মুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন, তা' হইবে!—বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশতলবর্ত্তী কোন এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি তাৎপর্য্যের কথা বল, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, আগে বিষয়টা কি বল দেখি? কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।

ব্যোম কহিল, শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ স্বর্গীয় নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে কিন্তু সে সামান্য।

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতর মুখে কহিল—গল্পটি বারোহাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড় হইবে না কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য্য বাহির হইয়া পড়িবে।

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল—কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।

সমীরণ দুইহাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, সঙ্কটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়?

ব্যোম কহিল, জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন যোগাইয়া চলিতে হয়। মন যোগাইবার অপূর্ব্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে, যে, ধরাতলে সৌন্দর্য্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ গন্ধ স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহারপূর্ব্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—যদি এমনভাবে দেখ, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখ! দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্ম্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য্য

আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না— তাই সে বলিতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল;" —তাহার কর্ণে যে সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহার আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,— "সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল!" আবার এই প্রাণপ্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে, অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মত সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয় যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হইতে পারে সে জন্য সর্ব্বদাই সে তাহার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরা-নুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়! বলে, প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব! কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে "বন্ধু অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই—কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকারনিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভি-সারে আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া-ছিলাম?" এই করুণ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলন-বন্ধনের অবসান, সেই মাথুরযাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার

সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ—তাহার মত এমন শোচনীয় বিরহ দৃশ্য কোন প্রেম কাব্যে বর্ণিত আছে!

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল—তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি! তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রেম। এবং জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে জগতের সর্ব্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদি প্রেম এই দেহের ভালবাসা যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই—সে দিন কোন কবি উপস্থিত ছিল না, কোন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল, যে, এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে;—প্রেম নামক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল—আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে, যে, এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম—কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্তমনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্ততঃ কিছু দীর্ঘকাল দেহদেবযানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে! তোমরাও সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সমীরণ কহিল—ভ্রাতঃ ব্যোম, তোমার মুখে ত কখনও শাস্ত্র-

বিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খৃষ্টানের মত কথা কহিলে? জীবাত্মা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গ লাভ করিয়া সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সকল মত ত তোমার পূর্ব্বমতের সহিত মিলিতেছে না।

ব্যোম কহিল—এ সকল কথায় মতের মিল করিবার চেষ্টা করিও না। এ সকল গোড়াকার কথা লইয়া আমি কোন মতের সহিতই বিবাদ করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসায়ে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্য-প্রচলিত মুদ্রা লইয়া মূলধন সংগ্রহ করে—কথাটা এই দেখিতে হইবে, ব্যবসা চলে কি না। জীব সুখদুঃখবিপদসম্পদের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সংসার-শিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া জীবনযাত্রা সুচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মুদ্রাটি মেকি নহে। আবার যখন প্রসঙ্গক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে, তখন দেখাইয়া দিব, যে, আমি যে ব্যাঙ্কনোট্‌টি লইয়া জীবন-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিধাতার ব্যাঙ্কে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ক্ষিতি করুণস্বরে কহিল—দোহাই ভাই, তোমার মুখে প্রেমের কথাই যথেষ্ট কঠিন বোধ হয়—অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এখান হইতে অবতারণ করিতে হইবে, আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য্য শুনাইতে পারি।

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া জান্‌লার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল, আমি দেখিতেছি এভোলুশন থিয়রি অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ

অভ্যাস করিতেছে—সহস্র বৎসর কেন, লক্ষ সহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংশের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দ্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তর-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে ;—

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্য্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায় গ্রহণ, গুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, ঠিক বটে। ও গুলা তাৎ-পর্য্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্ততঃ দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। – বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বামপদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভাল বাসিতেও হইবে এবং সে ভালবাসা কাটিতেও হইবে ;—সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়।

সমীরণ কহিল—গল্পটার সর্ব্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে

তোমবা কেহ সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যা লাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না। আমি সেই অভিশাপসমেত একটা তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছি যদি ধৈর্য্য থাকে ত বলি।

ক্ষিতি কহিল, ধৈর্য্য থাকিবে কি না পূর্ব্বে হইতে বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমিত আরম্ভ করিয়া দাও শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।

সমীরণ কহিল—ভাল করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক্ কোন কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে যে সংসারকে ভাল বাসিল না তাহা নহে কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও,সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্ত্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না; সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, তুমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।—সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার

কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভাল করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না। সেই জন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার মন্ত্রনা কাজে প্রয়োগ করিতেন। ব্রাহ্মণকে রাজাসনে বসাইয়া দিলে ব্রাহ্মণও অগাধ জলে পড়িত এবং রাজ্যকেও অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিত।

তোমরা যে সকল কথা তুলিয়াছিলে সে গুলা বড় বেশি সাধারণ কথা। মনে কর যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য্য এই যে, রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য্য এই যে, উপযুক্ত অবসরে স্ত্রী পুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা বলা যায় না।

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল—আমার ত মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখ কাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোন নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা নাই কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্ব্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তুতরু-

লতাতৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে কোনকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্ব্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সঙ্কটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছিল সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না,অত্যাচারপীড়িতা রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জা-নিবারণ, নামক অত্যন্ত সাধারণ, স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচদেবযানীসংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ কাহিনী বিবৃত আছে সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।

সমীরণ হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন- শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এক্ষণে স্বয়ং কবি কি বিচার করেন একবার শুনা যাক্।

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় তখন স্ব স্ব প্রকৃতিঅনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুণ

ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুণ ধরিবামাত্র কেহবা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহবা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহবা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপরে শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশ-টুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভফুল হইতে কেহবা তাহার রং বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উদ্ঘাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই!

কেরাণী।

(১)

খেটে খেটে খেটে ;—
সারাদিন আপিসে কাগজ 'পত্তর' ঘেঁটে,—
লিখে লিখে ব্যথা হোল আঙ্গুলগুলোর গিঁটে ;
যেন এক হোয়ে গেল মাজায়, ঘাড়ে, পীঠে ;
পায়ে ধর্‌ল বাত ;
অসাড় হোল হাত ;
ঘুরে গেল মাথা, বসে সকাল থেকে রাত ;
কোথা সেই ১১ কোথা সেই ৬টা,—
শরীর হোল আগুণ ; মেজাজ হোল চটা।

(২)

খেটে খেটে খেটে ;—
তাড়াতাড়ি খেয়ে চারটি, চাদর চাপকান এঁটে ;
গেলাম সেই আপিসে একটু না থেমে,
ওচট্ আর ধুলো খেয়ে, দুপর রোদে ঘেমে ;
হুঁকো টেনে ক'সে,
ভাঙ্গা 'চ্যারে' ব'সে,
মণ খানিক কাগজে কলম ঘ'সে ঘ'সে—
মাথায় বেরোল ঘাম ; ঠোঁটে লাগ্‌ল কালি ;
গোঁফ গেল ঝুলে, খেয়ে সাহেবের গালি।

(৩)

খেটে খেটে খেটে ;
আসি রোজ রোজ শ্বেত পদযুগ চেটে ;—

কালো মূর্ত্তি দেখিলেই সাহেব যায় ক্ষেপে ;
গোরামুখ দেখিলেই প্রাণ উঠে কেঁপে ;
তার একটি তাড়ায়,
যেন ভূত ঝাড়ায় ;
ইচ্ছা হয়, চ'লে যাই ছেড়ে এই পাড়ায় ;
স্ত্রীর উপর হয় রাগ, জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসার হয় অসহ্য—গুড়গুড়ি বিনা।

(৪)

খেটে খেটে খেটে ;
ক্লান্ত দেহে এলাম যদি ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়ুতে নাই জল ; গামছা গ্যাছে হারিয়ে ;
ছুতর আজো চারপায়খানা দেয়নিক সারিয়ে ;
ধুতি গেছে উড়ে ;
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট' চটি বিছানায়, একপাট' আঁস্তাকুড়ে ;
বিশু গ্যাছে বাজারে ; ঘুমোয় রামা কুঁড়ে ;
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

(৫)

খেটে খেটে খেটে ;
ক্ষুধায় যেন দাবানল জ্বলে যায় পেটে ;
বাহিরের অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ির মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি,
জলখাবার ভাবি ;
—সব ফক্কিকার—গিন্নির হারিয়ে গ্যাছে চাবি ;

—আসে নাই সন্দেশ ; দুধ ফেলে দিয়েছে মেয়ে ;
গ্যাছে সব রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

(৬)

খেটে খেটে খেটে ;
—বলিতে দুঃখের কথা বুক যায় ফেটে—
চাইলাম অন্ন ত গিন্নী এলেন তেড়ে,
তাঁর সুদর্শন চক্র, স্বর্ণনথ নেড়ে ;—
"সারাদিন খাটি,
শরীর কোরে মাটি,
পোড়ার মুখো, কাহিল হোলাম যেন একটি কাটি ;
ছেলে কোলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুলে গেল পা টা ;
তবু বলে 'শুয়ে আছ' নিয়ে আয় ত ঝাঁটা।"

(৭)

খেটে খেটে খেটে ;—
মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম্ম, দাবানল পেটে,—
এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রালয় ছাড়ি,
একবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি ;
—হায়রে অধর্ম্ম
ছেড়ে সব কর্ম্ম,
যাঁর গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় ঘর্ম্ম,
সেই ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে 'পোড়ার মুখো' ;
—কলিকাল।—অরে রামা নিয়ে আয়ত হুঁকো।

(৮)

খেটে খেটে খেটে,—
এলাম যদি খেয়ে স্ত্রীর ঝাঁটা 'কড়ামিঠে'—

কোণেতে জড়ান দেখি তক্তাপোষের পাটি ;
ফরাসের সতরঞ্চে এককোমর মাটি ;
পুত্রবর গিয়ে
হুঁকোটি নিয়ে,
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি পোবে তাকিয়ায় করিছেন নৃত্য ;—
ঘুমোচ্ছেন পার্শ্বে তাঁর রামকান্ত ভৃত্য।

(৯)

খেটে খেটে খেটে,—
খেলাম চারটি ছোলা আর দুটো আঁব কেটে ;
চিবিয়ে একটি পান—আর হোলে তামাক সাজা,
দিলাম তিন টান, তখন ভাব্‌লাম 'আমি রাজা'।
রামাকে দিয়ে তাড়া
প্রদীপ কোল্লেম খাড়া
ডেস্কোব উপর ; আর তখন ফরাস হোলে ঝাড়া,
বোস্‌লেম তার উপরে পেতে একটি পাটি ;
তবলা নিয়ে ধাঁই কোরে দিলাম তিন চাঁটী।

(১০)

খেটে খেটে খেটে ;—
এলে কয়টী এয়ার তিন চা'র পাড়া ঝেঁটে,
ত্রিশ বাজি তাস আর তিন বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হোল খেতে বাড়ির মধ্যে আসা ;
—রাঁধুনীর গুণ—
ডালে ঘোর নুন
মুখ গেল পুড়ে—পানে ভয়ঙ্কর চুণ,—

রাঁধুনীকে বোকে, গিন্নীর উপর রেগে,
চলিলাম শয়নের ইন্দ্রালয়ে বেগে।

(১১)

খেটে খেটে খেটে,
চলিলাম ক্রুদ্ধ যদি অন্নপূর্ণা-ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দাবর আঁখি ;
বুঝিলাম তখনই গিন্নীর সব ফাঁকি ;—
গোঁফে দিয়ে চাড়া,
নখে দিলাম নাড়া ;
গিন্নী তখনি উঠিলেন হোয়ে ঠিক খাড়া ;
—বেধে গেল যুদ্ধ ; হোল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়্‌ল ঘুমের দফায় ইতি।

(১২)

"খেটে খেটে খেটে"
বোল্লেন গিন্নী "কড়া পড়্‌ল হাতে বাট্‌না বেঁটে—
গায়ে হোল বাত, চুল গেল উঠে
মেয়ে কোলে কোরে কোরে ;—আমি কি তোর মুটে ?
—হায় কোন্ পাপে
হতচ্ছারা কাপে
কুলীনের মেয়েকে বিয়ে দিল বাপে ?
তার উপর আবার চোপা ; আমার উপর আবার চটা ;
নিয়ে আয়না আন্‌তে পারিস্ আমার মত কটা ?

(১৩)

"খেটে খেটে খেটে
হলাম কি দ্যাখ্ নির্লজ্জ, পাষণ্ড, বোম্বেটে।'

দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত ও সটাং,
আর আমার মেজাজটি ছিল সে দিন চটাং ;
আর অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সব সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা ;
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে,—অতি পরিপাটি
ঠিক গিন্নীর বাঁ মাথায় দিলাম এক চাঁটী।

(১৪)

খেটে খেটে খেটে
হয় গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু ; নয় ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী ;
তাহা ঠিক জানি না ; কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নী সেই চড়ে,
সটাং গেলেন প'ড়ে,
মূর্চ্ছা ; যেন তাল গাছ আশ্বিনের ঝড়ে ;
আর হোল যখন জ্ঞান, এমন বদ্‌লে গেল তাঁর
সেই কড়া মেজাজ—যে সে অতি চমৎকার।

(১৫)

খেটে খেটে খেটে—
হাড় হোল মাটি ; ঘর হোল মেটে ;
শয্যা হোল তক্তাপোষ ; না খেয়ে না দেয়ে,
বিব্রত নিয়ে তিন আইবুড় মেয়ে ;
বেছে বুড় বরে
কুলীনের ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয়, পরিশ্রম কোরে ;

স্ত্রী হোলেন গতাসু, শোকতপ্ত অমনি—
আমি কোল্লাম বিয়ে এক ন বর্ষীয়া রমণী।

(১৬)

খেটে খেটে খেটে –
হ'য়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল ও বেঁটে ;—
প'ড়ে গেল কপালে বড় বড় রেখা ;
কাণে যায় না শোনা ; চোখে যায় না দেখা ;
চল্লিশ বছর থেকেই
চুল গেল পেকে ;
মাংস গেল ঝুলে ; শরীর গেল বেঁকে ;
দাঁত হোল জীর্ণ ; ভুঁড়ি গেল থেমে ;
চিবুক গেল উঠে, নাক গেল নেমে ।

(১৭)

খেটে খেটে খেটে—
দিন গেল মাস গেল, বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায় বাঙ্গালী বাবু
খেটে, খেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু ;—
ক্রমে ও ক্রমে,
রক্ত গেল জমে,
শীর্ণ হোল দেহ ; জোর গেল কমে ;
মাথাটা বসে না যেন ভাল আর ঘাড়ে ;
মাংসে ধর্‌ল ছাতা, ঘুন ধর্‌ল হাড়ে।

(১৮)

খেটে খেটে খেটে
যে কদিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে ;

বিধাতার আদালতে পরকালে গিয়ে,
উত্তর দেবার আছে—"দিইছি তিন মেয়ের বিয়ে;
তাহাই আমার ধর্ম্ম,
তাহাই আমার কর্ম্ম,
বিয়ে দিতে দিতে প্রায় কেটে গ্যাছে জন্ম ;
আর, নিজে দুই বিয়ে কোরে ফুরিয়ে গ্যাল 'প্রমায়' ;
আর কিছু করিবারে পাইনিক সময়"।

ফুলজানি *।

সহরে বিচিত্র জটিল ঘটনা, লোকজনের গতিবিধি, গাড়ি ঘোড়া কলকারখানায় সমস্ত মানুষ ছোট হইয়া যায়। মানুষ স্বরচিত শিল্পে, স্বপ্রবর্ত্তিত ইতিহাসে, এবং স্বকণ্ঠোচ্ছ্বসিত কোলাহলে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সহরে কে বাঁচিল কে মরিল,কে খাইল কে না খাইল তাহার খবর কেহ রাখে না—সেখানে বড় লাট ছোট লাটের কীর্ত্তি, চীনে জাপানে লড়াই, অথবা একটা অসামান্য ঘটনা নহিলে সর্ব্বসাধারণের কানেই উঠিতে পারে না।

কিন্তু পল্লিগ্রামে ছোট বড় সকল মানুষ এবং মনুষ্যজীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; এমন কি, নদীনালা পুষ্করিণী মাঠঘাট পশুপক্ষী রৌদ্র বৃষ্টি সকাল বিকাল সমস্তই বিশেষ রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানকার লোকালয়ে সুখদুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্য্যন্ত গণনার বিষয় হয়, এবং প্রকৃতির

---

* ফুলজানি। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

মুখশ্রীর সমস্ত ছায়ালোকসম্পাত একটি ক্ষুদ্র দিগন্তসীমার মধ্যে মহৎ প্রাধান্য লাভ করে।

উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ সহর পল্লিগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনও উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি, জটিল ঘটনাবলী, এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তিব সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে—সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ অণুআকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়; আবার কোনও উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্ত্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্ত্তিস্তম্ভমালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘনজনতা-বন্যার সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহুদূরে ধূলিশূন্য নির্ম্মল নীলাকাশ-তলে, শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখ দুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

শ্রীশ বাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য। এবং, পল্লীর বাগানেব উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে; কোথাও বা চিকণ পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুম্‌কি বসাইয়া দেয়, কোথাও বা জীর্ণ গোয়ালঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও বা ঘন-ছায়াবেষ্টিত দীর্ঘিকাজলের একটি মাত্র প্রান্তে নিকষের উপর সোনার রেখা কষিয়া দেয়;—তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্ততঃ যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্ম্মল স্নিগ্ধহাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয় দৃশ্য-টিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

শ্রীশ বাবু আমাদিগকে বাঙ্গলাদেশের যে একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রদ্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই, তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে। এখানে সুগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফতুসেখ এবং নায়েব মহাশয় সকলেই আমাদের প্রতিবেশী—পরস্পরের মধ্যে ছোট বড় ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতিদিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্য্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনরূপ কৃত্রিম মালমসলার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকদের চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্ব্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য

ক্ষমতার কাজ ; বাঙ্গালার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ বাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে,কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন,এবং সেই কাজ করিতে গিয়া নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ বাধাইয়া বসেন। প্রতিভাবহির্গামী এই দুরাশায় তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাস "শক্তিকাননে"র মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ "ফুলজানি"রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মেয়েটির নাম কালী, তাহার স্বভাবটি যেমন মিষ্ট তেমনি দুষ্ট তেমনি স্বাভাবিক ; গ্রন্থের নায়িকা ফুলকুমারীর প্রতি তাহার যে সুদৃঢ় ভালবাসা সেও বড় স্বাভাবিক ; কারণ, ফুল নিতান্ত নিরুপায় ভীরুস্বভাব—এত অধিক নির্জ্জীব, যে, পাঠকের হৃদয়াকর্ষণে সে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে ;—কিন্তু এইরূপ নির্ভরপরায়ণ সামর্থ্যহীনের জন্যই বলিষ্ঠ তেজস্বীস্বভাব আপনাকে একান্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ফুলকুমারী যদিও গ্রন্থের নায়িকা, কিন্তু তাহাকে একটি শূন্যপটের মত অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে গ্রন্থকার কালীকেই অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সামান্য পল্লীর কালো মেয়েটি অসাধারণ হয় নাই কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কখন্ যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা জানিতেও পারা যায় না। বোসেদের ফুলবাগানের মধ্যে, তালপুকুরের ধারে এই দুটি ক্ষুদ্র বালিকার সখীত্ব আমরা সস্নেহে সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম ; তাহার মধ্যে পাঠশালার ছেলেদের দৌরাত্ম্যকোলাহল, বালকবিদ্বেষী উত্যক্ত বাগ্‌দি বুড়ির অভিশাপমন্ত্র, মধ্যাহ্নে পক্ষীনীড়লুণ্ঠক ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক আন্দোলিত ঘন আম্রবনের ছায়া এবং নিভৃত দীর্ঘিকার সন্তরণাকুল

অগাধশীতল জলের তরঙ্গভঙ্গ মিশ্রিত হইয়া একটি মনোহর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গ ইহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম, ইহার অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করি নাই, এমন সময় হরিশপুর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ আম্রবনচ্ছায়ার মধ্যে একটুখানি অলৌকিকের ছায়া আসিয়া পড়িল। ফুল স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার আসন্ন বিবাহ শুভ হইবে না, এবং বাগ্‌দি বুড়ির মুখেও যেন সেই অভিশাপ শুনিতে পাইল, এবং বটবৃক্ষের শাখা হইতেও সেই অভিশাপ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনই বুঝিলাম, ফুলকুমারীর বিবাহও সুখের হইবে না, এবং পাঠকের কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দেও অভিশাপ লাগিয়াছে। কিছুকাল পরে ফুলকুমারীও তাহার দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া গেল পাঠকও পুনশ্চ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়া ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার একটা ফাঁড়া আছে।

সেখানে প্রবেশ করিয়া নায়েব মহেশ্বর ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শান্তিসৌন্দর্য্যময় পল্লিটির মধ্যে ইনিই রুদ্ররসের অবতারণা করিয়াছেন। রৌদ্রীশক্তিতে গৃহিণী জগদ্ধাত্রী আবার স্বামীকেও অভিভূত করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, যে, প্রজাবর্গ, অসহায় হস্তীর ন্যায়, পড়িয়া আছে; নায়েব, সিংহের ন্যায়, তাহাদের স্কন্ধের উপর চড়িয়া রুধির শোষণ করিতেছেন, এবং গৃহিণী জগদ্ধাত্রী, দেবী জগদ্ধাত্রীর ন্যায়, এই প্রচণ্ড সিংহের স্কন্ধে পা রাখিয়া বসিয়া আছেন।

ছেলেটির নাম পুরন্দর। যদিচ তিনিই এই গ্রন্থের নায়ক, তথাপি সাধারণ ছেলের মত পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, বট গাছে চড়িয়া কাকের ছানা পাড়িয়া আমোদ অনুভব করেন, গাছের ডাল হইতে ঝুপ্ করিয়া দিঘির জলের মধ্যে পড়িয়া

ফুৎকারে আকাশে জলক্ষেপ করিতে করিতে চিৎসাঁতার কাটেন — দেখিয়া আমাদের বড় আশা হইয়াছিল পাঠকের কপালগুণে ছেলেটি আর যাহাই হৌক্ অসাধারণ হইবে না। কিন্তু "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে!" কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

শান্ত, মধুর অথচ সুদৃঢ়স্বভাব নিস্তারিণীর চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এই নিস্তারিণীর কন্যা ফুলকুমারীর সহিত যথাকালে নায়েব মহাশয়ের পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নায়েব মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের বেহাইনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিবাহের পর উভয় বৈবাহিক পক্ষে ছোট-খাট পল্লীযুদ্ধ চলিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় পুত্র পুরন্দরকে, তাঁহার বেহাইনের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার জন্য, সঙ্গে করিয়া আপন কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়া মৌলভির নিকট হাফেজ পড়িয়া এবং পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পুরন্দর একটা নূতনতর মানুষ হইয়া উঠিল। মানুষের পরিবর্ত্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং পুরন্দরের স্বভাবে পরিবর্ত্তনের প্রচুর কারণও ছিল। কিন্তু আমরা যে গ্রামদৃশ্য, যে সরল লোকসমাজ, যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ যাপন করিতেছিলাম নূতনীকৃত পুরন্দর তাহাকে যেন অত্যন্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। পুরন্দর ভাল ছেলে হউক্ সে ভাল; তাহার দানধ্যানে মতি হউক্, হরিনামে প্রীতি হউক্, শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এবং হাফেজে অনুরাগ বাড়িতে থাক্, আমাদের দেশে সচরাচর যেরূপ ভাবে অনেক লোকের মনে সংসারবৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে পুরন্দরের হৃদয়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সঞ্চার হউক্ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু তাহার

বেশি কিছু হইতে গেলে তাহাকে আর সহ্য করা যায় না। কারণ, ফুলজানি উপন্যাসকে সম্পূর্ণতা দেওয়াই পুরন্দরচরিত্রের একমাত্র সার্থকতা। অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া যদি তিনি উপন্যাস নষ্ট করেন তবে আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিব না। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইতে ফুলজানিতে যে এক স্বচ্ছ সুন্দর সারল্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল পুরন্দর হঠাৎ অসাধারণ উচ্চ হইয়া উঠিয়া তাহাকেই প্রতিহত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা পুরন্দর সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহার গতি এবং প্রকৃতি বিষাদের দিকে। মানুষ সংসারে, যে কারণেই হউক, দুঃখকষ্ট সহিতে আসিয়াছে, এই রকম তাহার মনের ভাব। আত্মজীবনের একটা লক্ষ্য তাহার তখনও স্থির হয় নাই কিন্তু আপনার বিষয়ে ভাবিতে বসিলেই তাহার মনে হইত, অতিঘোর আঁধারে তাহার ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন। মনের এই অবস্থায় আনন্দের ভিতরেও সে মনশ্চক্ষে দেখিত, যে কেহ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেরই জীবন অল্প-বিস্তর দুঃখযন্ত্রণাময়।" পুরন্দরের এই অনাসৃষ্টি দুঃখভাবের গূঢ়-কারণ অনতিপরেই একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। একদা তিনি এবং তাঁহার বন্ধু ব্রজ বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরের এক শালিকের কোটরের নিকট এক বিষধর সাপের সহিত শুক-দম্পতির যুদ্ধ চলিতেছে। সেই পক্ষীদের নিরীহ শাবকগুলি এখনি সর্পের কবলস্থ হইবে মনে করিয়া পুরন্দরের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। তাহার সঙ্গী ব্রজ অসাধারণ বালক নহে এই জন্য সে এক ফোঁটা জল না ফেলিয়া এক খণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাহাতে অধিক কাজ হইল, আহত সর্পটা জলে পড়িয়া গেল। ব্রজ পুনশ্চ তাহার প্রতি লোষ্ট্রবর্ষণ করাতে পুরন্দর তাহা সহিতে

পারিল না, বাবণ করিল। "সে ভাবিতেছিল খাদ্যখাদকের, অহি-নকুলের যে বিষম বিদ্বেষ ভাব, ইহার জন্য কে দায়ী? ভগবানের সংসার প্রেমময় না হইয়া কেন এমন হিংসাদ্বেষসঙ্কুল হইল?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া "ব্রজ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ে ব্যথা কোন্ খানে, বুঝিতে পারিল। বুঝিল, পুরনের দুঃখ ব্যক্তিগত নহে।"

টার্পিন্‌তেল মালিশ করিলে যে সকল ব্যথা সারে, অভাব মোচন হইলে যে সকল দুঃখ দূর হয় উপস্থিতক্ষেত্রে সেই সকল ব্যথা এবং সেই সকল দুঃখই ভাল। প্রচলিত প্রবাদে গরীবের ছেলের ঘোড়ারোগকে যেরূপ অনর্থের হেতু বলিয়াছে, বাঙ্গলা দেশীয় পল্লির ছেলের এ সকল বড় বড় ব্যথা এবং উঁচুদরের দুঃখও সেইরূপ সর্ব্বনাশের কারণ।

পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় পথিমধ্যে অসন্তুষ্ট প্রজাগণকর্তৃক নিহত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী সহমৃতা হইলেন। পুরন্দর এই আঘাতে পীড়িত হইয়া বাড়ি গেলেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীর শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিধবা নিস্তারিণী শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

এইখানে গ্রন্থ শেষ হইল কিন্তু গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন। অকস্মাৎ একদল যবন এবং যবনী মিলিয়া কালী ও ফুলকে চুরি করিয়া লইয়া গেল—কালী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিল—ফুল সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল,—পুরন্দর তাহাকে উদ্ধার করিতে গেল এবং উভয়ে ঘাতকহস্তে বিনষ্ট হইল।

এ সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কি যোগ? প্রথম হইতে এমন কি সকল অনিবার্য্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার যদি বলিতেন গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলেই মরিয়া গেল তবে কাব্যহিসাবে তাহার সহিত ইহার প্রভেদ কি? ১৬৬ পাতায় বইখানি সমাপ্ত—১২২ পাতায় নিস্তারিণী তীর্থে গেলেন। তাহার পর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে ইহার কোন সূত্রপাত ছিল না, ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গেও ইহার কোন যোগ ছিল না। এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্যটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশতঃ শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। আমরা শকুন্তলার তপোবনচারীর ন্যায় দুই হস্ত উদ্যত করিয়া বলিতেছি—

নখলু নখলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ববত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।

বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ।

নৈরঞ্জনা নদীতীরে একটি শালবন ছিল। সিদ্ধার্থ সমস্ত দিবস সেই বনের শীতল ছায়া সম্ভোগ করিয়া অবশেষে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় একটি উচ্চভূমি নির্ব্বাচন

করিয়া তাহা লতা পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া লইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"আমি এই স্থানে এখন সাধনে নিযুক্ত হইব। যদি এই-বার প্রকৃত জ্ঞান না পাই, তাহা হইলে আমার অস্থি চর্ম্ম যেন এই স্থানেই সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং আমার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।" তাহার পর অশ্বত্থকে পশ্চাতে রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। কিন্তু মার তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুগমন করিতেছিল। সে বলিল—"এ পৃথিবী আমার অধিকার। আমিই ইহার অধিপতি। সিদ্ধার্থ যে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে তাহা আমি হইতে দিব না।" এই ভাবিয়া সে সিদ্ধার্থের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বপ্রথমে সে কোন উদ্ধত ভাব দেখাইল না। আস্তে আস্তে সিদ্ধার্থের নিকট গিয়া বলিল—"তুমি করিতেছ কি? দেবদত্ত তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমার রাজবাটী, স্ত্রী পুত্র পরিবার, সকলই তাহার হস্তগত হইয়াছে। এখানে আর থাকিও না। শীঘ্র গিয়া যশো-ধরাকে লজ্জা, অপমান ও অধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর।" তাহার পর সিদ্ধার্থ নানাবিধ মায়ারূপ দেখিতে লাগিলেন। যশোধরা তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টিতে পড়িলেন—সেই রাজবাটী, সেই কপিলবাস্তু, সেই শাক্যজাতি—কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আরও ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাহার পর নানা প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হইল। মার তাঁহাকে ভয় দ্বারা পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিল। কথিত আছে যে, হঠাৎ এমন ঝড় উঠিল যে তাহাতে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসকল উৎপাটিত হইয়া স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হইল, অর-ণ্যের বৃক্ষসমূহ ভূপাতিত হইল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পর প্রস্তরবৃষ্টি, তরবারি ও খড়্গবৃষ্টি পর্য্যন্ত হইল। চারি-

দিক ঘন ধূম ও অগ্নিশিখাতে আচ্ছন্ন হইল এবং তাহার পর ঘোর তমোরাশি আকাশ ও পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ একান্ত মনে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। শিলারাশি পুষ্পমালা হইয়া তাঁহার শরীরকে শোভিত করিল। তাঁহার দেহের লাবণ্যে অন্ধকার অপসারিত হইল। মার লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার তিন দুহিতা ছিল, তাহাদিগের নাম রতি, রাগ এবং তৃষ্ণা। মার ইহাদিগকে সিদ্ধার্থের নিকট প্রেরণ করিল। ইহারা মায়াবেশ ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার মোহিনী শক্তি প্রয়োগে সিদ্ধার্থকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নৃত্য, গীত, হাবভাব, যত প্রকার প্রলোভন তাহাদের সম্বল ছিল সকলই চালনা করিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটল—কামের প্রচণ্ড বাত্যার মধ্যে অবিচলিত ভাবে রহিলেন। সেই সৌম্যমূর্ত্তি তখন কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল! পাপের ভয়ঙ্কর কোলাহলে, কামের প্রচণ্ড আলোড়নে, রিপুকুলের ঘোর নির্যাতনে তিনি শান্তভাবে কেবল অপার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন। সংসার নানা উপায়ে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তিনি তখন সংসারের অতীত রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মারদুহিতাদিগের কোন আক্রমণই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিল না। তাহারা পরাভূত হইয়া সিদ্ধার্থকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগত হইল, এবং পিতার নিকট নিজ দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিল। অবশেষে সংসার নিস্তব্ধ হইল, সিদ্ধার্থ ঘোর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। বিশুদ্ধ চিন্তার পক্ষে সংসারই একমাত্র প্রতিবন্ধক। একদিকে পাপবাসনা, অপর দিকে সংসারভাবনা, কত প্রকার বিষয় মনকে বিচলিত করে। সেই জন্য সংসারের

ভিতর থাকিয়া অপার্থিব বিষয়ে মনঃসংযোগ করা মানুষের পক্ষে এত দুরূহ ব্যাপার। ঋষি মুনিরা গৃহ পরিবার ছাড়িয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সেখানেও পাপের কোলাহল মনের ভিতর দিয়া শ্রুত হইত। যোগের ব্যাঘাত গৃহে অরণ্যে সমানই থাকে। সিদ্ধার্থ এখন নিষ্পাপ হইলেন। ছয় বৎসর ঘোর তপস্যা সাধন করিয়া শরীর মনের শৃঙ্খল একটি একটি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আর শরীর পাপের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবে না, আর মন কামনা-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না। আত্মারূপ মন্দিরে আপনার বলিয়া আর কেহ রহিল না। যাহা কিছু তাহার মধ্যে দূষিত ও দুর্গন্ধ ছিল সকলই দূরীভূত হইল। আত্মা এবং অনন্ত জগৎ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না। আত্মারূপ পক্ষী অনন্ত আকাশে উড়িল।

পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করা মহাপুরুষদিগের জীবনের আরম্ভ মাত্র। ইহার কারণ সহজে বুঝা যায়। মনুষ্যের প্রাণ কত সূত্রে শরীরের সঙ্গে গ্রথিত আছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? মৃত্যুর সময় এই সমুদয় সূত্র, সমুদয় গ্রন্থি, সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হইলে তবে ইহকাল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যদি শারীরিক বিয়োগ এত যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহা হইলে মানসিক বিচ্ছেদ কতই না ভয়ঙ্কর হইবে! জন্মাবধি কতপ্রকার বন্ধন আসিয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কত মায়া, কত মমতা, কত আশা, কত সুখ, কত সম্ভোগ – কত প্রকার আকর্ষণ আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখে। মোক্ষার্থী এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে তবে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন। মন যখন ধর্ম্মার্থী হয় তখন প্রথমতঃ সে এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে কি সহজে কৃতকার্য্য হয়? মন মনের সঙ্গে

সংগ্রাম করিতেছে এ যুদ্ধ বড় ভয়ানক যুদ্ধ। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ হয় তাহা বাল্যক্রীড়া মাত্র। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে কোথায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ,কোথায় বা ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। মানবদিগের যুদ্ধে ঘোর রক্তস্রাব, অগণ্য অস্ত্রশস্ত্রের সঞ্চালনা, বৃহদাকার কামানের বিকট রব, ক্ষতবিক্ষতদিগের আর্ত্তনাদ, উভয় পক্ষের আস্ফালন শব্দ, এই সমস্ত কারণে চক্ষু নিপীড়িত হয়, কর্ণ বধির হয় এবং হৃদয় ভয়ে উদ্যমহীন হয় বটে ;—কিন্তু এ সকল যুদ্ধের আরম্ভ হয়, এবং ইহাদিগের শেষও আছে। পাপসংগ্রাম আর এক বিপরীত কাণ্ড। মনে কর একটি মনকে রিপুকুল সংহার করিতে চেষ্টা করিতেছে,সহস্র প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। একটি একটি পাপ মরিতেছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মরিতেছে সেই মুহূর্ত্তেই যেন রক্তবীজের ন্যায় পুনর্জীবিত হইতেছে। পাপ মরিয়াও মরে না, এবং এ যুদ্ধের শেষও হয় না। একজন সাধু বলিয়া গিয়াছেন যে মনুষ্যের পরীক্ষার শেষ ইহকালে লক্ষিত হয় না। একজন বীরপুরুষ হয়ত ইহ সংসারে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয়ধ্বজা লইয়া পরলোকগামী হইতেছেন। তিনি স্বর্গধামের দ্বারে আসিয়া হয়ত দেখিবেন যে একজন সুন্দরী কামিনী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত আছে। শাক্যের জীবনে আমরা এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন, যতবার জয়লাভ করিতেছেন, ততই যেন পরীক্ষা এবং প্রলোভন আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। মার তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছে। মায়া, ভয়, সুখের আশা, ধনের আশা, রাজত্বের আশা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন সকলকে পরাভব করিলেন, যখন মুক্তি সম্মুখে,

ঠিক সেই সময়ে মারের দুহিতারা মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগে আহ্বান করিতেছে। এ যুদ্ধ ভয়ানক যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোক ইহাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। কেবল যুগে যুগে এক একজন মহাপুরুষ ইহাদিগকে পদদ্বারা দলন করিয়া পৃথিবীকে আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধার্থের মনে আর পাপ কিম্বা পাপচিন্তা রহিল না। মোহ-কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হইলে পুণ্য তাহার বিমল জ্যোতি চারিদিকে বিকাশিত করিল। দুরূহ বৃহৎ কার্য্য সাধনের পক্ষে পাপ-চিন্তাই একমাত্র প্রতিবন্ধক। সে প্রতিবন্ধক এখন বিনষ্ট হইল, সিদ্ধার্থ এখন তাঁহাব মহৎ ব্রতে ব্রতী হইতে পারিলেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; জলাশয়ের ন্যায় ইহার চঞ্চলতা। সামান্য বায়ুর হিল্লোলে ইহার বক্ষ চঞ্চল হইয়া থাকে। প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার দৃষ্ট হয়, গোলাকার বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয়। মনও সেইরূপ কোন চিন্তায় নিমগ্ন হইতে চাহিলে প্রথমে সুস্থিরতা অবলম্বন করে। কিন্তু কোথা হইতে একটি সামান্য সংসারচিন্তা বা অর্থচিন্তা বা কামচিন্তা আসিয়া পড়ে। সেই চিন্তা ক্রমে সমুদায় মনকে অধিকার করিয়া বসে এবং যতক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে মন আপন ব্রত বিস্মৃত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চেতনা লাভ করিয়া সে যখন নিজ ব্রতসাধনপথে ফিরিয়া আসে আবার অন্য কোন চিন্তা তাহাকে অন্যদিকে লইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা বশতঃ সাধারণ লোকে কোন রূপ প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে না। কেবল সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অসার বিষয়ে মগ্ন থাকে। সেই জন্য পাপচিন্তা কার্য্য-সাধনের প্রধান প্রতিবন্ধক। সিদ্ধার্থ সেই পাপচিন্তা হইতে এক-বার নিষ্কৃতি পাইলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি

মারকে পরাস্ত করেন। এখন রাত্রি সম্মুখে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। দূরস্থিত গ্রামসমূহের জনতারব ক্রমে ক্রমে শ্রুতি হইতে তিরোহিত হইল। পক্ষীসকল ক্রমে নীরব হইল। দিবসের আলোক ম্লান হইয়া জ্যোৎস্নার সুস্নিগ্ধ কিরণে পরিণত হইল। আকাশে কেবল একমাত্র পূর্ণ চন্দ্র এবং কতিপয় উজ্জ্বল নক্ষত্র পৃথিবীতে যে অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান ছিল। বাহিরে সকলই নিস্তব্ধ, সিদ্ধার্থের মনের ভিতরও সমুদয় নিস্তব্ধ। আর সে পাপদাহের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী হস্ত পদস্থাপন করিয়া সিদ্ধার্থ অপূর্ব্ব চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তা আসিল। কথিত আছে যে সেই সময় অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাসমূহ তাঁহার উপর অবনত হইয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। জীবনের যতগুলি দুরূহ প্রশ্ন তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল এক এক করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রথমে এই প্রশ্নটি উত্থিত হইল—এই জগতে দুঃখ এবং মরণ আছে তাহার কারণ কি? প্রশ্নের উত্তর সহজে আসিল—জন্ম আছে বলিয়া। জন্মের পূর্ব্বাবস্থা কি? ভব, অর্থাৎ কর্ম্মফলজনিত বিশেষ কোন জীবের শরীরগ্রহণ যে শরীর লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে। ভব কি হইতে আসে? উপাদান অর্থাৎ একটি প্রিয় প্রস্তর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। উপাদানের কারণ কি? তৃষ্ণা অর্থাৎ কাম্য বস্তু সম্ভোগের বাসনা। তৃষ্ণা কি হইতে হয়? বেদনা* অর্থাৎ বাহ্য জগতের সহিত চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়দিগের সংস্পর্শ হইলে মনের মধ্যে যে সুখকর বা দুঃখকব অবস্থা হয়। বেদনার কারণ

* ইংরাজীতে Sensation.

কি? স্পর্শ অর্থাৎ বাহ্য জগতের সহিত ইন্দ্রিয়দিগের সংস্পর্শ। কোন দ্রব্যের প্রতিমা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইলে আমরা তাহাকে স্পর্শ বলি। স্পর্শের কারণ কি? ষড়ায়তন, অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। ষড়ায়তনের কারণ কি? নামরূপ, অর্থাৎ বাহ্যজগতের প্রকাশ – জগত যেরূপে আমাদিগের গোচর হয়। নামরূপ কি হইতে আসে? বিজ্ঞান, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Consciousness বলে। বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, অর্থাৎ অনুভব বা কল্পনা। ইহা দ্বারা আমরা যাহা মিথ্যা বা অসার তাহাকে সার বলিয়া কল্পনা করি। এই জগত কেবল মাত্র ছায়া এবং ইহার প্রকাশ কেবল মাত্র ছায়া-বাজি। এখনি যাহা প্রকাশিত হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু মানবেরা এই ছায়াকে সার পদার্থ বলিয়া অনুভব করে। সংস্কারের কারণ *কি? অবিদ্যা। এই অবিদ্যা তবে জরা মৃত্যুর কারণ*, এবং এই অবিদ্যাকে দূর করিতে পারিলে জন্ম, জন্মঘটিত দুঃখ এবং তৎপরবর্ত্তী মৃত্যু এ সকলকে দূর করিতে পারা যায়। *

* এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। সিদ্ধার্থ যে ঠিক এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। তিনি যে প্রণালী দিয়া জ্ঞান লাভ করুন না কেন, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার ভাবটিকে বহু শাখা প্রশাখা দিয়া এই কার্য্যকারণসূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুমোদিত শাস্ত্র সকল আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে হয়ত এই শৃঙ্খলাটি সংলগ্ন ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে না পারে। সেই জন্য ইউরোপীয় টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা আমাদিগের নিকট তত পরিষ্কার ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহঁদিগের মধ্যে মহামান্য Burnouf যে অর্থ দিয়াছেন আমরা আপাততঃ তাহারই পক্ষ অনেকটা সমর্থন করিলাম। কিন্তু ইহাতেও যে কার্য্যকারণ তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল তাহা আমরা বলিতেছি না। বাস্তবিক বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বহির্জগত ও অন্ত-

যখন সিদ্ধার্থ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা এইরূপে নির্ণয় করিলেন, তখন তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিলেন—"এইবার আমি যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। অবিদ্যাই সকল অনিষ্টের মূল, যেহেতু অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়াতয়ন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মৃত্যু উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা হইতে জীব সকল জন্মিতেছে, এই অবিদ্যা হইতে পরিবর্ত্তনশীল জগত নিত্য ও স্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অবিদ্যার অন্ধকারে জীবজগত মগ্ন হইয়া আছে। কি প্রকারে এই অবিদ্যাকে দূর করিয়া দেওয়া যায়? কেননা অবিদ্যা গেলে বৃথা কল্পনা বা সংস্কার থাকে না। যাহা অসার তাহাকে সার বলিয়া কল্পনা করিব না। সংস্কার গেলে বিজ্ঞান থাকিবে না। সেই বিজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে নামরূপও থাকে না। ইহারা জগতের গুণসমষ্টি অর্থাৎ properties। নামরূপ চলিয়া গেলে ইন্দ্রিয় সকলও থাকিবেনা। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই বাহ্যজগত ও নামরূপ আমাদিগের গোচর হইতেছে। যদি দ্রষ্টব্য পদার্থ না থাকে, চক্ষের আর ব্যবহার থাকে না।

জগত, সাকার নিরাকার, abstract, concrete এ সকলকে কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করিতে গিয়া এখনকার মতে এত ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহা হইতে কোন অর্থ টানিয়া বাহির করা সহজ নহে।

এ স্থলে কার্য্য কারণ শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে ভাবে আমরা ভগবানকে জগতের কারণ (First cause) বলি, সে ভাবে কারণ এস্থলে ব্যবহৃত হইতেছে না। কারণের অর্থ পূর্ব্বাবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থা হইলে আর একটি অবস্থা হইতেই হইবে। পূর্ব্বাবস্থাকে কারণ বলে। যথা, পক্ষিশাবকের কারণ ডিম্ব, মৃত্যুর কারণ শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ বিকার, বৃক্ষের কারণ বীজ, ঋতুর কারণ পৃথিবী সূর্য্যের এক পার্শ্বে থাকা ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয় যদি না থাকে স্পর্শ কোথা হইতে আসিবে? এবং স্পর্শ যদি না হয়,তাহা হইলে বেদনা কোথায় পাইব? যদি কাম্য বস্তু না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দেখিব কোথা হইতে? বেদনা যদি না আসে, তৃষ্ণাও আসিবেনা, এবং যদি তৃষ্ণা চলিয়া যায়, কোন প্রিয় পদার্থের প্রতি আমার মন দৌড়াইবে না। প্রিয়পদার্থের সম্ভোগ না হইলে জন্ম হইবে না, এবং জন্ম না হইলে মৃত্যুও থাকিবে না। অতএব অবিদ্যাকে মূলে কাটা উচিত।"

পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমরা অনেকবার এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা আরম্ভ হইতে শেষ এবং শেষ হইতে আরম্ভ পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থকে দিয়া আবৃত্তি করাইয়া লইলাম! ইহার কারণ এই যে যখন সিদ্ধার্থ এই শৃঙ্খলাটি মনে মনে অনুভব করিলেন, তখন তিনি ইহার সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইহাকে বারবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে ইহাতে কোন ভ্রম নাই, তখন তিনি আর একটি যুক্তিমার্গে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে চারিটি মহাসত্য জানিতে পারিলেই মনুষ্য ভ্রম এবং অবিদ্যা হইতে রক্ষা পায়। সে চারিটি মহা সত্য কি? (১) জীবন দুঃখে পূর্ণ। (২) সে দুঃখের কারণ আছে। সে কারণ তৃষ্ণা—যে তৃষ্ণা কখন চরিতার্থ হয় না। (৩) সে কারণ দূর করিয়া দেওয়া যায়। (৪) সে কারণ দূর করিবার একটি পথ বা মার্গ আছে।

(১) দুঃখ কি? না জন্ম, বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু, যাহা অরুচিকর তাহার সঙ্গে সংশ্রব, যাহাতে চিত্ত অনুরক্ত তাহা হইতে বিচ্ছেদ, মায়া।

(২) দুঃখের কারণ কি? যে কাম্য বস্তু মায়াবৎ, ভ্রমমূলক, যাহা কখন সম্ভোগ করা যায় না, তাহার জন্য অনবরত কামনা বা তৃষ্ণা। কোন সুন্দর বাহ্য পদার্থ ইন্দ্রিয়ে অভিঘাত হইলে তাহা পাইবার

জন্য ইচ্ছা হয় কিম্বা দেখিলে আহ্লাদ হয়। এই তৃষ্ণা ক্রমাগত থাকাতে জীবনের উপর মায়া জন্মে। ইহাই দুঃখের কারণ।

(৩) দুঃখ বিনষ্ট হয় কিসে? এই তৃষ্ণা, এই জীবনের কামনাকে সম্পূর্ণরূপ বিনাশ করিলেই দুঃখ বিনষ্ট হয়।

(৪) দুঃখ বিনাশের উপায় কি? ধর্ম্মজীবনই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মজীবন অষ্ট প্রকারে হইতে পারে, যথা (১) বিশুদ্ধ মত, (২) বিশুদ্ধ ভাব, (৩) বিশুদ্ধ কথা, (৪) বিশুদ্ধ কার্য্য (৫) বিশুদ্ধ জীবনোপায়, (৬) বিশুদ্ধ চেষ্টা, (৭) বিশুদ্ধ স্মৃতি (৮) বিশুদ্ধ চিন্তা। অর্থাৎ কথায়, চিন্তায়, ভাবে এবং কার্য্যে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই দুঃখ বিনষ্ট হয়। যিনি বিশুদ্ধ নীতি অবলম্বন করেন, তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখসমূহের অতীত হইতে পারেন।

আর্য্য গাথা। *

গ্রন্থখানি সঙ্গীতপুস্তক এই জন্য ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে না। কারণ, গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময় গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, সঙ্গীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সঙ্গীত সেখানে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুল পরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট—

* আর্য্য গাথা। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন সকল ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দ্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহেতুকী - সেই সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই সমস্ত আবেগ উদ্বেগগুলি সঙ্গীতেই বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য, যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না—ননদিয়া, গগরিয়া, চুনরিয়া আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র কিন্তু সঙ্গীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মত প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবেগ, এক অনির্ব্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়। সামান্যতঃ পাথরের নুড়ি বালকের খেলেনা মাত্র, হিন্দী গানের কথাও সেইরূপ ছেলেখেলা—কিন্তু নির্ঝরের তলে সেই নুড়িগুলি ঘাতে প্রতিঘাতে জলস্রোতকে মুখরিত করিয়া তোলে, বেগবান্ প্রবাহকে বিবিধ বাধা দ্বারা উচ্ছ্বসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র্য দান করে;—হিন্দিগানের কথাও সেইরূপ সুরপ্রবাহকে বিচিত্র শব্দসংঘর্ষ এবং বাধার দ্বারা উচ্ছ্বসিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে, অর্থগৌরব বা কাব্যসৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে না। ছন্দ সম্বন্ধেও একথা খাটে। নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভাল হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দীগানের কথায় কোন ছন্দ থাকে না - সেই জন্যই ভাল হিন্দিগানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব্ব ও সুন্দর—সে ইচ্ছামত হ্রস্বদীর্ঘের সামঞ্জস্য বিধান করিতে করিতে চলে, স্বাধীনতার সহিত সংযমের সমন্বয় সাধন করিতে করিতে বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় গুরুগম্ভীর ভেরিধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাকে পূর্ব্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া

গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সঙ্গীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হয়।

বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখন কখন একত্র মিলিয়া থাকেন। সঙ্গীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সঙ্গীতও আপন তালসুরে উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য্য করিতে থাকেন।

হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এদেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভাল করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সঙ্গীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড় বড় কাব্যও সুর সহকারে সর্ব্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণবকবিদিগের গানগুলিও কাব্য—কেবল চারিদিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগুলি তাহাদের ডানাস্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্যরচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

বঙ্গদেশের কীর্ত্তনে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিয়াছে; তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোনার কবিতা ভরা-

সুরের সঙ্গীতনদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সঙ্গীত কেবল যে কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহা নহে তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য্য এবং ঔদার্য্য এবং মর্য্যাদা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দেখা যায় ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্যসমালোচকের অধিকারবহির্ভূত। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ—যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে গানগুলির মাধুর্য্যও সম্ভব সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা, গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে তথাপি ভাল এন্‌গ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েল্‌পেণ্টিংয়ের সৌন্দর্য্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি উদাহরণস্বরূপে "একবার দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিব নিশি" কীর্ত্তনটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি এমন বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত গান অল্পই দেখা যায়। পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকুতি-পূর্ণ সঙ্গীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ যে সুরে এই গান বাঁধা হইয়াছে তাহা আমাদের কল্পনার আদর্শের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। না হইবারই কথা। কারণ, এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বিচিত্র; এবং আমাদের সঙ্গীত সাধারণতঃ একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ীভাব অবলম্বন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করে; ভাব হইতে ভাবান্তরে বিচিত্র আকারে ও নব নব

ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে না। এই জন্য আমাদের বক্ষ্যমান কবিতাটির উপযুক্ত রাগিণী আমরা সহজে প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু কোন স্বর না থাকিলেও ইহাকে আমরা গান বলিব—কারণ, ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়—যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হইতেই তুলনার দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারি।

সে কে?—এজগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ;
সে কে?—অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস;
সে কে?—দূর হতে দূরাত্মীয় প্রিয়তম হতে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন;
সে কে?—লতা হতে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারিনা আজীবন;
সে কে?—দুর্ব্বলতা যার বল; মর্ম্মভেদী অশ্রুজল;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার;
সে কে?—যার পরিতোষ মম সফল জনমসম;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার;
সে কে?—হলেও কঠিন চিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে;
সে কে?—বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার; অপমান নাই
শতবার পাদুখানি ছুঁয়ে;

সে কে ?—মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি প্রহেলিকামাঝে !

ইহা কবিতা, এবং ভাল কবিতা—কিন্তু গান নহে। সুর সংযোগে গাহিলেও ইহাকে গান বলিতে পারি না। ইহাতে ভাব আছে এবং ভাবপ্রকাশের নৈপুণ্যও আছে কিন্তু ভাবের সেই স্বতউচ্ছ্বসিত সদ্যউৎসারিত আবেগ নাই যাহা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটা সঙ্গীতময় কম্পন উৎপাদন করিয়া তুলে।

ছিল বসি সে কুসুম কাননে।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে) ;
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি
অতুল গরিমারাশি।

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো) ;
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি
হাসি,হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে, পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।

তার সরল সুঠাম দেহ ; (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা' দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;

পরে স্বজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ সরম স্নেহ।

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে);
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সুমিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়
কোকিলকুজিত গান।

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো);
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে কে জানে।

এই কবিতাটির মধ্যে যে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি। অর্থাৎ, লেখক একটি সুখস্মৃতি এবং সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে আমাদের মনকে যেরূপ ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন তাহা সঙ্গীত দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে এবং যখন কোন কবিতা বিশেষ মন্ত্রগুণে অনুরূপ ফল প্রদান করে তখন মনের মধ্যে যেন একটি অব্যক্ত গীতধ্বনি গুঞ্জরিত হইতে থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিয়াছেন, অন্যান্য কবিতা হইতে গানের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা সামান্য কথাবার্ত্তার মধ্যেও যখন সৌন্দর্য্যের অথবা অনুভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে চাহি তখন স্বতই আমাদের কথার সঙ্গে সুরের ভঙ্গী মিলিয়া যায়। সেই জন্য কবিতায় যখন বিশুদ্ধ

সৌন্দর্য্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সঙ্গীতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে ;—

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ;—

এই পদটিতে যে গভীর প্রীতি এবং একান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি কথার দ্বারা হইয়াছে? না, আমরা মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত করুণ স্বরসংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি? ঐ দুটি ছত্রের মধ্যে যে কটি কথা আছে তাহার মত এমন সামান্য এমন সরল এমন পুরাতন কথা আর কি হইতে পারে! কিন্তু উহার ঐ অত্যন্ত সরলতাই শ্রোতাদের কল্পনার নিকট হইতে সুর ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। এই জন্য, ঐ কবিতার সুর না থাকিলেও উহা গান। এই জন্যই

হরষে বরষ পরে যখন ফিরিবে ঘরে,
সে কেরে আমারি তরে আশা করে রহে বল ;
স্বজন সুহৃদ সবে উজল নয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজ্জল ;—

ইহা কানাড়ায় গীত হইলেও গান নহে, এবং

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক্ হইয়ে থাকি ;—

ইহাতে কোন রাগিণীর নির্দ্দেশ না থাকিলেও ইহা গান।

আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়াছে। ইংরাজি ভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে দোষ নাই কিন্তু এমন অনেকগুলি ভাব আছে যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, সেগুলি বাঙ্গলায় বর্জ্জনীয়।

"চেয়ো না বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে,"

ইংরাজিতে "cold" শব্দের সহিত যে একটি অপ্রিয় ভাবের যোগ আছে বাঙ্গলায় তাহা নাই এবং হইতেও পারে না। সেই জন্য "হিম আঁখি" শব্দটা কানে বিজাতীয় বলিয়া ঠেকে। ইংরা-

জিতে love এবং hate দুই বিপরীতার্থক শব্দ। স্থানভেদে hate শব্দের স্থলে বাঙ্গলায় ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরাগ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতি-শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। আর্য্যগাথায় স্থানে স্থানে ঘৃণা শব্দের অপপ্রয়োগ হইয়াছে।

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি কাঁদুক্ মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনাহীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ!

শেষ দুটি ছত্রের অর্থ বুঝাই কঠিন। বোধ করি ইহার অর্থ এই রূপ—আমি দীনহীনার ন্যায় কাঁদিব না, কঠোরা তাপসীর ন্যায় হইয়া ঘৃণারূপ তিক্তপদার্থ তাহাকে ঢালিয়া দিব। বাঙ্গলা ভাষায় বীভৎসতা অথবা হীনতার প্রতিই ঘৃণা প্রয়োগ হইয়া থাকে—কিন্তু কবি এ স্থলে ঔদাসীন্য, উপেক্ষা অথবা বিরাগ অর্থে ঘৃণা ব্যবহার করিয়াছেন। "দিব তিক্ত ঢালি তারে" ইহাতে বাঙ্গালার প্রয়োগনীতি রক্ষিত হয় নাই।

কোন কোন গানের পদ এতই বিপর্য্যস্তভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহ চেষ্টাসাধ্য হইয়া পড়ে;—

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে বারে যে তা'রে গেছে এ প্রাণে ঘিরি সে বিনে।

গানের ভাষায় একপ অসরলতা দোষ মার্জ্জনীয় নহে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কবি স্কচ্, ইংরাজি এবং আইরিশ্ গানের যে সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষা অনেক স্থলে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছে। সেগুলি এগ্রন্থে স্থান না পাইলে ক্ষতি ছিল না।

সর্ব্বশেষে আমরা আর্য্যগাথা হইতে একটি বাৎসল্য রসের গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ স্নেহের সহিত কৌতু-কের সম্মিশ্রণ দেখিতে পাইবেন।

একি রে তার ছেলে-খেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখ্‌বে বল্‌বে "ওমা, এনে দে, ওমা দে!"

'নেবো নেবো' সদাই কি এ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,
ব'লে কি না দিতে পেড়ে—
—অসম্ভব যা-তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুন্‌লো কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল ধূয়ো অম্‌নি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ্‌ এ!
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অম্‌নি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভক্তচরিতামৃত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

এই দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় নব্যভারতে রূপ ও সনাতনের অকৃত্রিম সাধুতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে রূপ সনাতনের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট নহে। এমন কি, গৌড়েশ্বর হুসেন্‌ সাহা রূপকে পরস্বলুণ্ঠনকারী পলাতক দস্যু জ্ঞান করিতেন ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে, এবং সনাতন রাজকার্য্য হইতে অব্যা-

হৃতি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন একথাও চরিতলেখক স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য ভক্ত সাধুচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তাহার অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ মানুষের চরিত্র আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত নহে। অনেক গুলি ছিদ্র সত্ত্বেও মোটের উপরে চরিত্রবিশেষকে মহৎ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কালবিশেষে ধর্ম্মনীতির আদর্শের কথঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে ধর্ম্মনীতির যে অংশে সাধারণের শৈথিল্য ছিল এখন হয় ত সে অংশে নাই অপর কোন অংশে আছে। এক সময় ছিল, যখন সম্রাটের প্রাপ্য নবাব লুণ্ঠন করিত, নবাবের প্রাপ্য ডিহিদার লুণ্ঠন করিত এবং দস্যুতা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে বিরাজ করিত। সে দস্যুতা এক প্রকার প্রকাশ্য ছিল এবং সাধারণের নিকট তাহা লজ্জার কারণ না হইয়া সম্ভবতঃ শ্লাঘার বিষয় ছিল। সকলেই জানেন অল্পকাল পূর্ব্বেও উপ্‌রি পাওনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ভদ্রসমাজের মধ্যেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। মিথ্যাচার, বিশেষতঃ সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে একথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি কিন্তু একথা সত্য। অতএব, স্বসাময়িক সাধারণ দুর্নীতিবশতঃ কোন কোন বিষয়ে সৎপথভ্রষ্ট হইলেও মহৎলোকের সাধুতার প্রতি সম্পূর্ণ সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না।

তৃতীয়তঃ আমাদের সম্মুখে সমস্ত প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। সামান্য দুই একটা আভাস মাত্র হইতে বিচার করা সঙ্গত হয় না।

চতুর্থতঃ, রূপ এবং সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সকল গুণ ছিল যাহাতে নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে তাঁহারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন—এবং আজ পর্য্যন্ত তাহারই স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে অন্য সমস্ত প্রমাণাভাবে ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোর বাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য্য —মানবজীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্বসকল যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোর বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভাল লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জ্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন ত তিনিই সুখী হইয়াছেন আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।

ঠগী কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরিলিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে।

—

সাধনা।

বিচারক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর-বাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল মন্দ অনেক সুখ দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্রক্ষমতার গৃহপ্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবন-লাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর-

রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়; হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা কাছে আসিয়াছে ভালবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-তাপ-বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত, সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্ব্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়, তখনও, যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মত শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার এবং মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই;—যখন তাহার মনে পড়িল আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন

করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাটাহস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যা-অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জজ্ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান্। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকীলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দু মহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড্-ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি; মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চসমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবীবরণের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্ত্তিকটির মত ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশি বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চোদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশি সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশতঃ সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী

পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মত ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎযন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন,—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সঙ্কটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত সহজ, সম্মুখবর্ত্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথ-গুলিই *প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে* এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্ত্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্ম্মকোষের চতুর্দ্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপ্‌ড়ি গুলির মত স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট্‌-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জ্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক চলাচল দেখিত; ফেরি-ওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালারা, যে, জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতামাত্র।

আর সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটিবেশধারী গর্ব্বোদ্ধত

স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া, তাহাকে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মত মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড, পিঞ্জরের পক্ষীর মত, বক্ষপঞ্জরের উপর উদ্দাম আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ, প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশিকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত এবং আপন জীবন যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মত পুড়াইয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার

সম্মুখবর্ত্তী ঐ হর্ম্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন্ তাহাকে "বিনোদচন্দ্র" নামক মিথ্যাস্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল— এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে, উল্লাসে সঙ্কোচে, সন্দেহে সম্ভ্রমে, আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল,—তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার তাহার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মত কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—এবং অবশেষে কখন্ একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেম-

শশি "বিনোদচন্দ্র" ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল তখন সে লজ্জায় এবং ধিক্কারে মাটিতে মিশাইয়া গেল। অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এস!" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশির মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না;—মনে পড়িল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা,—এ সমস্তই তাহার কাছে পরম-শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মত বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিতে পারিল না এ সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা

এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের তাহা ইতিপূর্ব্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই! ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসঙ্কোচ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশির এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে, এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটখাট ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কি লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কি লাঞ্ছনা কি হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে! হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল;—সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে; আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস!" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন,—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে "একঘেয়ে" হইয়া উঠে এই জন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও

নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিক তর্পণ করেন এবং সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এক-কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই এক দিন পরে ভোজন-বিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরীতরকারী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপবাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীবোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধা-ইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণ-স্বরে করযোড়ে কহিল—ওগো জজ্ বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি

আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করিবে তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না! গহনাই মেয়েদের সর্ব্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন—কই, আংটি দেখি! প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আগ্রা। *

ভারতবর্ষের এই বিভাগটি অতীব বিচিত্র। আগ্রা হিন্দুদিগের আর একটি মহানগরী—ইহা বেনারস হইতে ১৭৫ মাইল দূর। এখান হইতে যেন আর একটি নূতন জগতের আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ মুসলমানদিগের নগর ও ইংরাজদিগের নগর। বড় বড় হোটেল, সৌধ-শুভ্র বড় বড় বাগান-বাড়ি, তাহার চারিদিকে জাঁকাল বাগান, বিস্তৃত সুচ্ছায় তরু-পথসকল, সযত্ন-রক্ষিত বিস্তৃত কৃত্রিম উপবন বিরাজমান; সেখানে কায়দা-দুরস্ত ঘোড়-সোয়ারেরা দুল্‌কি চালে ঘোড়া চালাইতেছে, "স্কচ্-গ্রে" পল্টন-ভুক্ত বীরপুরুষ সৈনিকেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কল-কারখানার ধূম-নল আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধূমরাশি উদ্গার করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার আমি কলিকাতা নগরেও দেখিয়াছি। হিন্দুদিগের পাগ্‌লামি কাণ্ড দেখিবার পর, এই মহম্মদীয় সাদা-সিধা ধরণের মস্‌জিদগুলি দেখিয়া একটু যেন তৃপ্তি লাভ হয়। কিন্তু এই মস্‌জিদগুলির গঠন-উপাদান অতীব কদর্য্য—চুন বালির প্রলেপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং একবার দেখিলে আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

এখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা প্রকৃতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার প্রকৃতি দেবী সুখময়ী ও শান্তিময়ী—আর্দ্রভূমি দাক্ষিণাত্যের ন্যায় প্রগল্‌ভা ও অতিভূষিতা নহে। আকাশ ফিকে নীল, শীতল-প্রায় বায়ু লঘু নিঃশ্বাসে ঝুরঝুরু বহিতেছে; সেই চিরন্তন তালজাতীয় বৃহৎ বৃক্ষের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মদেহ

---

* *Dans L' Inde* নামক ফরাসী ভ্রমণ-পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

তরু সকল সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পল্লব-রাশির মধ্য দিয়া সর্-সর্ শব্দ করিতেছে; নারাঙ্গী জাতীয় নেবু সকল ঝোপ্-ঝাড়ের মধ্যে স্বকীয় স্বর্ণকান্তি বিকাশ করিতেছে এবং আমাদের দেশের অপেক্ষা জম্‌কালো, স্বকুমার গোলাপ-গুচ্ছ স্থপরিচিত স্থগন্ধ বিস্তার করিতেছে। এই গোলাপসকল দেখিলে, ইরাণীদিগের প্রকৃতি ও ফর্দ্দুসীর কবিতার ভাব মনে মনে কল্পনা করা যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নিহত ব্যক্তিগণ এই গোরস্থানে চিরবিশ্রাম উপভোগ করিতেছে। এখানকার পুষ্পরাজি সমানভাবে প্রস্ফুটিত—ইহাদের সৌন্দর্য্য এখানেও সমানভাবে বিকশিত হইতেছে। 'রেসিডেন্সি' গৃহ—যাহা সর্ হেন্‌রি লরেন্‌স্ মুষ্টিপ্রমাণ সৈন্য লইয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ভগ্নাবশেষ মাত্র—অগ্নিবর্ষণে কালিমা-গ্রস্ত—কামানের গোলায় ছিদ্রীকৃত—হরিদ্‌বর্ণ শাখা পল্লব সমাকীর্ণ লতাজালে বেষ্টিত হইয়া আছে এবং তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণ পুষ্পগুচ্ছসকল অগ্নিশিখার ন্যায় ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

এই মাত্র লক্ষ্ণৌ অবরোধের বর্ণনা আমি পুনর্ব্বার পাঠ করিলাম। এই ইতিহাসের মধ্যে বিশেষরূপে বিস্ময় আকর্ষণ করে কি?—না, সেই হৃদয়ের উচ্চ ভাব যাহা বিপদের সময় আত্মরক্ষাদিগকে বল বিধান করিয়াছিল। সাহসিকতা, যশস্পৃহা, স্বদেশানুরাগ, এই সমস্ত ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও কিছু অধিক ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের প্রকৃতির অন্তস্তলে একপ্রকার গভীর গর্ব্বভাব ও নছোড়বন্দা দৃঢ়তা এবং তা ছাড়া অতি গম্ভীর উচ্চ-ধরণের ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল।

যে সকল সেনানায়ক ও সৈনিকেরা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, উহারা প্রতিদিন প্রাতে বাইবেলের সাম-গান শ্রবণ করিত—

সেই সাম-গীতি যাহা উহাদের 'পিউরিটান' পুর্ব্বপুরুষেরা নির্যাতন-কালে আপনাদিগকে উৎসাহিত ও সবল রাখিবার জন্য এক-সময়ে গাহিয়াছিল। বাইবেলের এই মহান্ বাক্য সকল এই সৈনিক পুরুষদিগের হৃদয়ে নিস্তব্ধ গম্ভীর উৎসাহানল প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছিল—সেই উৎসাহানল যাহা বিপৎকালে নির্ভীক-চিত্তে ও শান্তভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিবার বল বিধান করিয়া থাকে। "যিনি স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই হেন্‌রি লরেন্‌স্, এইখানে বিশ্রাম করিতেছেন, মহাপ্রভু যেন ইহাঁর আত্মার সদ্‌গতি করেন।"—এই কথাগুলিমাত্র একটি সুরভি-পূর্ণ ক্ষুদ্র গোরস্থানের একটি ক্ষুদ্র সমাধি-প্রস্তরে খোদিত আছে।

আজ কাণপুরে সেই প্রসিদ্ধ কূপ দেখিলাম, যাহার মধ্যে নানা সাহেব ইংরাজদিগের সন্থতন মৃতদেহসকল নিঃক্ষেপ করিয়াছিল—সেই সকল স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু যাহারা তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ উপবনের নিস্তব্ধতা ও পুষ্পরাজির কমনীয় প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে। কূপের চারিধারে গথিক ধরণের প্রস্তর-গরাদিয়ার ঘের। কূপের ধারে একটি পাষাণময় এঞ্জেল-মূর্ত্তি পক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান—নেত্রের অবনত দৃষ্টির মধ্যে স্বর্গের শান্তি ও মাধুর্য্য দীপ্যমান—মার্জ্জনা-ভঙ্গীর ইঙ্গিতে, যুক্ত কর-যুগল নিম্নদিকে বিলম্বিত।

.. ..

আমরা এক্ষণে ক্রমাগত, উত্তর পশ্চিমে, মুসলমানদিগের প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিতেছি। ভারতবর্ষের এই রেল-পথের বন্দোবস্ত আমার খুব ভাল লাগে। গাড়ির মধ্যে স্বতন্ত্র প্রসাধন-কক্ষ আছে—সেখানে স্নানাদি করা যায়। গাড়ির গায়ে, উপরদিকে, শয্যামঞ্চ আট্‌কান থাকে, হাত-পা ছড়াইতে ইচ্ছা করিলে, সেগুলা

নামাইয়া দেওয়া যায়। রাত্রিকালে, এই এক একটি শয্যা-মঞ্চে শুই-বার প্রত্যেক যাত্রীরই অধিকার আছে। যদি পথে কেহ আহার করিতে ইচ্ছা করে, তবে গাড়ি-রক্ষককে পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া রাখিতে হয়; রক্ষক তার-যোগে আহার প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রচার করে—গাড়ি থামিলেই ষ্টেসনে আহারের আয়োজন প্রস্তুত দেখা যায়। প্রাতঃকালে হাজ্‌রি, একটার সময় টিফিন, ছয়টার সময় খানা প্রস্তুত থাকে। এইরূপে, সহস্র সহস্র মাইল-ব্যাপী স্থান, বিনা শ্রান্তিভোগে, অক্লেশে অতিক্রম করা যায়; তখন, সেই সকল গরিব বেচারাদিগের কথা মনে করিয়া দুঃখ হয়, যাহারা রাত্রির গাড়িতে, পারী নগর হইতে উঠিয়া, অনিদ্রাতে একেবারে নিষ্পেশিত ও জ্বরভাবাপন্ন হইয়া, মাসেই কিম্বা ব্রেষ্ট নগরে আসিয়া পৌঁছে।

আমার সহযাত্রীরা সকলেই বিশ্রম্ভালাপকারী, সামাজিক ও খোষমেজাজী। রাজকর্ম্মচারী, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রি, ব্যবসাদার—এই সকল সহযাত্রীদিগের সহিত ১৫ মিনিটের মধ্যেই আলাপ হইয়া যায়। ইহাঁদের কথাবার্ত্তা জেনটেলম্যানের ন্যায় ভদ্র ও সকল সময়েই প্রায় শিক্ষাপ্রদ। সার্ব্বজনিক বিষয়ে ইহাঁদের অনুরাগ আছে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে—রুসের অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে, ইহাঁদের বিশেষ মতামত আছে। উহাঁদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে স্বকীয় পার্লেমেণ্ট স্থাপিত হইবে। ইনি একজন আত্মশাসনের পক্ষপাতী। ইনি আরও বলিলেন—"ভারতবর্ষকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।" কিন্তু, ইহাতে এসিয়া-খণ্ডের প্রাচীনা রাণীকে ইংরাজি বিবি করিয়া তোলা হইবে না কি? তিনি বলিলেন "এই শিক্ষার কাজ একবার শেষ হইয়া গেলে, এখান হইতে প্রস্থান

করা ছাড়া আমাদিগের আর কিছু করিবার থাকিবে না। তখনই ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।” তাঁহার কন্যারা এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল —কন্যা দুইটি মনোমোহিনী ইংরাজ বালিকা, একেবারে টাট্‌কা ও টুক্‌টুকে—সাদা ফ্ল্যানেলের সাদাসিধা পোষাক-পরা। উহাদের গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখশ্রী সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার এই ইংরাজ বাসিন্দারা লক্ষ্মীছাড়া লোক নহে—ইহাঁরা সচ্চরিত্র উদ্যোগ-শীল গৃহস্থ—ইহাঁরা আপনাদের ইংরাজী ‘হোমে’র স্বচ্ছতা, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া থাকেন।

“ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে”—ইংলণ্ড ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত, জাতিভেদের কুসংস্কার বিনষ্ট করিবার জন্য ইংরাজেরা বেশ একটি ফলদায়ী উপায় অবলম্বন করিয়াছে; উহারা হিন্দুদিগকে ভ্রমণে প্রবৃত্ত করাইতেছে। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া, রেল-গাড়ির মধ্যে বিচিত্র লোকের সংস্পর্শে আসিয়া, উহাদের শিক্ষা লাভ হইতেছে—উহাদের মন প্রসারিত হইতেছে। এই উদ্দেশে রেল-কোম্পানীরা, ভ্রমণ-খরচার হার, যতদূর সম্ভব, কমাইয়া দিয়াছে। আমার ভৃত্য যে টিকিটে, কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া দিল্লি ও বোম্বাই ভ্রমণ করিয়া, আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সেই টিকিটে সে প্রায় তিন হাজার মাইল ভ্রমণ করিল, অথচ টিকিটের মূল্য ৪৪ টাকা মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি প্রায় দেশীয় লোকেই পূর্ণ হইয়া যায়। এই চিত্রবিচিত্র লোকে পরিপূর্ণ গাড়িগুলি অপেক্ষা চিত্রবৎ মনোহর দৃশ্য আর দ্বিতীয় নাই।

এই রেলওয়ে লাইনের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও স্বত্বাধিকারী যদিও ইংরাজ কিন্তু ইহার কর্ম্মচারী প্রায় সমস্তই দেশীয় লোক। হিন্দু

মিস্ত্রি, হিন্দু চালক, হিন্দু ষ্টেসনমষ্টার। ইহাদের দ্বারা কিরূপ কাজ চলে তাহাও দেখা যায়। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় সেরূপ যন্ত্রবৎ কার্য্যপ্রণালী, সেরূপ ঠিক্‌ঠাক্‌ বন্দোবস্ত, সেরূপ গাম্ভীর্য্য, সেরূপ মতের স্থিরতা—এ সমস্ত উহাদের মধ্যে কিছুই নাই। আমি একবার, আমার জিনিসপত্র বেনারস হইতে একেবারে বোম্বায়ে চালান করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। তাহাতে ষ্টেসনে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; ষ্টেশনমাষ্টার, কেরাণী, গার্ড, আমার ভৃত্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল;—মহা কলরব—উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী—উত্তর প্রত্যুত্তরের অনন্ত প্রবাহ। ইহার দরুণ, আমাদের গাড়ি ছাড়িতে বিশ মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল, আমার তোরঙ্গ প্রভৃতির উপর নামধামের টিকিট আমার নিজেরই লাগাইতে হইল। না, ভারতবর্ষ এখনও একেবারে ইংরাজ হয় নাই—না, উহার শিক্ষা এখনও সাঙ্গ হয় নাই।

ষ্টেসনে পৌঁছিলে, আমার ভৃত্য তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমি ফল খাইতে চাহি কি না। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম, ক্ষুদ্র, ছিপ্‌ছিপে পাৎলা দুর্ব্বল আদর্শ-বাঙ্গালী—আমার এই ভৃত্যটি বড়ই কাজের;—একাধারে পথপ্রদর্শক, গৃহ-ভৃত্য, দোভাষী, সহচর সকলই। কেবল টেবিলে সে খানা খাও-য়াইবার কোন কাজ করিবে না, আমার সহিত তাহার এইটুকু বোঝাপড়া আছে। একজন খৃষ্টানকে শূকরের মাংস আহার করিতে দেখিলে,—মাংসাদির গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, যে মলিনতা সঞ্চিত হয়, তাহা কিছুতেই বিধৌত হইবার নহে। এই ব্যক্তি ইংরাজি বেশ জানে, এবং যে প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছে ইহারও হাটহদ্দ সে বিল-ক্ষণ অবগত আছে; তাই, সে মাসিক বেতন ৩০টাকা করিয়া আমার নিকটে চাহিয়াছে। এই ৩০ টাকাতেই তাহার ভরণ-

পোষণ চলিয়া যায়—তাহাও খুব কম খরচে সে নির্ব্বাহ করে। একটা তাঁবার হাঁড়িতে একটু চাউল সিদ্ধ করে—তাহাই ভূমির উপর উভু হইয়া বসিয়া আহার করে। আর, মুখ ধুইবার জন্য তাহার একটু জলের আবশ্যক। এ ছাড়া, তার আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। আমার জিনিসপত্রের তালিকা করা, আমার বোচকা বুচকির হিসাব রাখা, প্রতিবার ঐ সকলের গুণ্‌তি করা, যাহাতে আমি জিনিসগুলা না হারাই তাহার ব্যবস্থা করা—ইহাই তাহার প্রকৃত কাজ। আমার একটা রুমাল এদিক-ওদিক করিবার যো নাই, অমনি, তিন মিনিটের মধ্যেই সে কথা তার গোচরে আইসে, আর, আমাকে সমস্ত পকেট খোঁজাইয়া তবে ছাড়ে। ধর্ম্ম ও জাতিতে হিন্দু, সম্প্রদায় শৈব,—মনে হয়, যেন বানর ও গরুদের প্রতিই উহার বিশেষ ভক্তি। এই বিষয় লইয়া আমি যখন উহাকে উপহাস করি, উহার মুখে একটু হাসি দেখা দেয় মাত্র—কিন্তু কোন কথা কহে না।

ছেদিলাল জাতিতে শূদ্র। এই শূদ্রজাতি ব্রহ্মার চরণ হইতে উৎপন্ন। মনু বলেন "দেহ ও মন পরিশুদ্ধ, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের বিনীত দাস, কখন উদ্ধত নহে, ব্রাহ্মণের নিকটেই আশ্রয় যাচ্ঞা করে—ইহারাই প্রকৃত শূদ্র।" এই ব্যক্তি ফড়িঙ্গের ন্যায় বলবান —একটা কার্পেট ব্যাগের ভারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। তাই আমার সহিত এইরূপ বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহাকে কোন দ্রব্য বহন করিতে হইবে না। কিন্তু ওদিকে, সে ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করে, বিশ্বাসী কুকুরের ন্যায় আমার দরজার সামনে সর্ব্বদা শুইয়া থাকে এবং ভিক্ষুকেরা আমাকে আক্রমণ করিলে সিংহবিক্রমে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করে। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী —এই সকল ভাষার কতিপয় শব্দ এবং রাজা, শা, খান্ প্রভৃতি বড়

বড় লোকের ইতিহাস ইহার কতকটা জানা আছে। তাছাড়া লণ্ঠনের আলোকে কি একটা রহস্যময় ভাষায় গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত পাণ্ডিত্য সত্বেও, উহার হৃদয় অতীব বিনীত, প্রকৃত শূদ্রের ন্যায় ভীত ও বিশুদ্ধ-মনা।

উহার সহিত অনেকবার আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কলিকাতার প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারিদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াও সে খৃষ্টান হয় নাই; ছেদি ইংরাজদিগকে খুব ভাল বাসে। "ইংরাজ জজ গরিব লোককে বলে—তোর কথাই ঠিক ও ধনী লোককে বলে - তোর কথা ঠিক্ না।" এই ছোট-খাটো কথাটি বারম্বার পুনরাবৃত্তি হওয়াতেই ভারতবর্ষেঃইংরাজের রাজত্ব সুদৃঢ় হইয়াছে। ইংরাজের আমলে কৃষকেরা শান্তির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু কিম্বা মুসলমান রাজকর্ম্মচারী উহাদিগকে আর উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করিতে পারে না। নিয়মিতরূপে সরকারকে উহারা অল্পস্বল্প একটা নির্দ্ধারিত কর দিয়া থাকে—তাহার পর, যাহা অবশিষ্ট থাকে তৎসমস্তই তাহাদের নিজের। এক্ষণে উহারা নিরাপদের ভাব মনে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে—এই ভাবটি হিন্দু কৃষকের নিকট একেবারেই নূতন।

কিন্তু অপর পক্ষে, ছেদিলাল ইংরাজ সৈনিকদিগকে ভাল বাসে না। উহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত—"গরিব হিন্দুদিগকে উহাদের জিনিসপত্র বহন করিতে হয়।" এই কথাটুকুই যথেষ্ট। ব্রিটেন-সৈনিকদিগের গর্ব্বান্ধতা—উহাদের উদ্ধত নীরবতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। নীচ-শ্রেণীয় ইংরাজদিগের যে সুখ-স্বপ্ন, 'টমি অ্যাট্‌কিন্‌স্' ভারতবর্ষে আসিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত দেখিতে পায়; সে আপনাকে জেন্‌ট্‌লম্যান বলিয়া মনে করে এবং জেন্‌টেল্‌ম্যানের উপযুক্ত সেবা অন্যের নিকট হইতে আদায় করে। কতবার আমি দেখিয়াছি,

ইংরাজ সৈনিক ট্রেণ হইতে নামিতেছে,—গর্ব্বিত, প্রশান্ত, উন্নত-মস্তক—কটা চুল পমেটমের দ্বারা পেটি পাড়ানো—কায়দা-দুরস্ত-ভাবে দস্তানা-পরা—ছড়ি হস্তে—পাদুকা-সংলগ্ন অঙ্কুশ-কণ্টকের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে—ফুল্ল বক্ষ ও সুদীর্ঘ দেহের দ্বারা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া কুলীদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেছে - কুলীরা তাহা-দিগের বোচকা-বুচকির ভারে একেবারে অবনত হইয়া পড়িতেছে।

আমরা এক্ষণে, ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে - মুসলমানদিগের দেশে ধাবমান হইতেছি। আহা! এই অঞ্চলটি কেমন সুন্দর! অনন্ত প্রসারিত সমভূমি—মরুদেশ। স্থানে স্থানে, শুভ্র, বড় বড় খাঁক্ড়া ঘাস যেন রজত ঢালিয়া দিয়াছে—এক সার, আর এক সারের গায়ের উপর চাপিয়া পড়িয়া এই খাঁক্ড়া ঘাসগুলা দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের শুষ্ক ও সরল শিশ্‌গুলি ডাঁটা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং তদুপরি ধূমবৎ-লঘু পুষ্পগুচ্ছ-সকল বিকম্পিত হইতেছে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, হরিণেরা দুল্‌কি চালে ইতস্তত দৌড়িতেছে এবং দৌড়িতে দৌড়িতে সহসা থামিয়া, একটা পা উঠাইয়া, উদ্বিগ্নভাবে তাহাদের সংকীর্ণ মস্তক আমাদের দিকে ফিরাইয়া আছে। অতীব গম্ভীর, কতকগুলা সারস ও বক আমাদিগের গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। বৃহৎ আকাশ আলোকপ্রভায় বাষ্পবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সিধা ও ঝক্‌ঝকে রেলগুলা আমাদের সম্মুখ দিয়া হুহু করিয়া সরিয়া যাইতেছে—অদূরে এমন এক স্থলে গিয়া মিশিতেছে যেখানে আমাদের পৌঁছিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। রাত্রিকালে, এই শূন্য সমভূমির অন্ধকারময় নিস্তব্ধতা অতীব গম্ভীর। কখন কখন, বহুদূরে মহা নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি—শৃগালের উন্মত্ত চীৎকার,—কি এক রহস্যময় ভাবে হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে।

... ...

এই দেখো, আমরা সেই পূর্ব্বতন মোগলদিগের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে অনেক দেখিবার আছে; তন্মধ্যে ইমারৎ, প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এই মুসলমানেরা কালের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুঝাযুঝি করিয়াছে; পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইতে উহারা কিছুতেই সম্মত হয় নাই। এই মায়াময় জগতের পৃষ্ঠে, ক্ষণকালের জন্য যে সকল আত্মার উদয় হইয়াছিল, সেই শান্তিপ্রিয় স্বপ্নদর্শী হিন্দুরা আপনাদের কোন চিহ্ন না রাখিয়া, বিনাযুদ্ধে, পরমাত্মার মধ্যে পুনর্ব্বার বিলীন হইয়া গেল। পক্ষান্তরে, দুর্দান্তপ্রবৃত্তি, ইচ্ছাবলে বলীয়ান্ মুসলমানেরা জীবিতকালে যেরূপ তলোয়ার ও অগ্নির দ্বারা আত্ম-সংস্থাপন করিয়াছিল, সেইরূপ মৃত্যুর পরেও মণিমাণিক্য ও মর্ম্মর-প্রস্তরের দ্বারা এখানে স্বকীয় অস্তিত্ব সমর্থন করিল।

উহাদের মধ্যে আকবর একজন। নীরব নিস্তব্ধ ভূখণ্ডের উপর প্রথম দিনের অভ্যুদয়ের ন্যায়, তাঁহার সমাধি-মন্দির অক্ষুণ্ণ ও অক্ষতভাবে ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। চারিদিকে চারিটা তোরণ-দ্বার চারিটা স্মৃতিসূচক বিজয়-থিলান— তাহার পার্শ্বে মিনার-স্তম্ভ—মিনার-স্তম্ভের মাথায় চূড়া-কিরীটি বিরাজিত। এই দ্বার দিয়া একটি বিজন উদ্যানে প্রবেশ করা যায়—সেখানে হরিৎ-রাশির মধ্যে কাঞ্চন-গুচ্ছ সকল দোদুল্যমান। উহার প্রত্যেক অংশ হইতে লাল পাথরের বাঁধানো রাস্তা প্রসারিত—এই সকল রাস্তা কেন্দ্রস্থ স্মৃতি-মন্দিরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরটি যুগপৎ চীন ও আরব ধরণের। একটু একটু পিছাইয়া পিছাইয়া, একটার উপর আর একটা,—এইরূপ কতকগুল ছাদ উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত এবং তাহাদের শিরোদেশে মোগল ধরণের

চূড়া-কক্ষ সকল বিরাজিত। এখানে শূন্য যেন পূর্ণকে ধারণ করিয়া আছে। সরু সরু স্তম্ভশ্রেণী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্ম্মরফলক বহন করিতেছে। সেই সকল মর্ম্মর-ফলকের উপর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবিধ প্রস্তর, অতি পরিপাটীরূপে বসানো হইয়াছে, মর্ম্মরের শুভ্র গাত্রে উহারা যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। এই ছাদগুলি চতুষ্কোণ—উহার কুট্টিম-ভূমির উপর প্রস্তর-খচিত 'মোজেয়িক' কারুকার্য্য। ছাদের চারি ধারে সরু সরু থাম উঠিয়া ছুঁচালো ধরণের খিলান-গুলিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মর্ম্মর-স্তম্ভের পশ্চাতে,ছাদের চারি ধার দিয়া, একটা বারাণ্ডা-পথ ঘুরিয়া গিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম জালি-কাটা প্রস্তর-কবাট দ্বারা এই পথ বাহির দিক দিয়া রুদ্ধ। কবাটের শিল্প-কার্য্য এমন লঘু ও সুকুমার ধরণের যে, এখান-কার উজ্জ্বল তরুণ বায়ু উহার সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াও উহাকে ধ্বংশ করিতে পারিতেছে না। মন্দিরের অভ্যন্তরে, মধ্যস্থলে, সেই মধ্যবিন্দু যেখানে চতুষ্কোণের ব্যাস-রেখাগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে সেইখানে আক্‌বরের সমাধি-ভূমি প্রসারিত;—একটা লম্বা ধরণের চতুষ্কোণ মর্ম্মর-প্রস্তর—তাহার গায়ে, অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম-সকল খুদিয়া বাহির করা ও সেই পদ্মের সুকুমার বৃন্তসকল অতি মধুর ভঙ্গী সহকারে চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছে। তত্রস্থ তামসী ছায়ার মধ্যে, দুই শত বৎসর ধরিয়া, মোগল-সম্রাট নিদ্রা যাইতে-ছেন। বহির্ভাগে, আলোকের মধ্যে তাঁহার মহিমা ঘোষণ করি-বার উদ্দেশে, এই মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তূপ—এই সকল রঙ্গীন প্রস্ত-রের উজ্জ্বলতা—এই সকল প্রস্তরখচিত কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য—এই সকল পরিপাটী সরল রেখা-বিন্যাস—মজুর প্রজাদিগের কষ্টের বিনিময়ে শিল্পনৈপুণ্যের এই পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছে। আর সকলই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কেবল এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর স্থপতি-

শিল্পটি এই শান্তিময় ক্ষেত্রের মধ্যে নীল আকাশের নীচে এখনও বিরাজমান।

'অ্যাকর্ডিয়ন'-বাদ্যযন্ত্রের স্বরলহরী বায়ুমধ্যে বিচরণ করিতেছে। কতকগুলি ইংরাজ সৈনিক, এই সমাধি-মন্দিরের ছাদে বেড়াইতে আসিয়াছে। উহারাই উহাদের দেশীয় সুর বাজাইতেছে ·· ·· ··· বারাণ্ডা-গরাদিয়ার উপর হাতের কুনুই রাখিয়া, তাহাদের মধ্যে চারিজন পাইপের ধূম পান করিতেছে। সেই ধূম-লহরী, চারিদিক-কার দৃশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুধীর প্রশান্ত ভাবে ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইতেছে।

যে স্বপ্ন-দৃশ্য চিরকালের মত এখনি পলায়ন করিবে, তাহার বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া টুকিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। আজ ৯ ডিসেম্বর, সাড়ে এগারটা বেলা; দেখ, এই আক্‌বরের সমাধি-মন্দিরের উপর হইতে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দেখিতে পাইতেছি। ঐ দিকে ঐ প্রস্তরময় কবাট ও শুভ্র চূড়া-কক্ষশ্রেণী ছাড়াইয়া, এক খণ্ড চতুষ্কোণ উদ্ভিজ্জ-গালিচা। স্তূপাকৃতি—অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও বিচিত্র কুসুম-শোভায় সমুজ্জ্বল—একটা বৃহৎ কৃত্রিম উপবন—তাহার চারিদিকে বুরুজ-বিশিষ্ট প্রাচীর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে, স্মৃতিমন্দির হইতে সহস্রাধিক হস্ত দূরে, প্রকাণ্ড চারিটা তোরণ, লাল বেলে পাথরের চারিটা চতুষ্কোণ শিরোভূষণ গাঁথুনি—তাহাতে সাদা মর্ম্মরের চেক্‌নাই এবং তাহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ছুঁচাগ্র-খিলানের ছিদ্র বিরাজমান। তাহা ছাড়াইয়া, চারিদিকে পাটখিলা রঙ্গের বিস্তৃত ক্ষেত্র। হল্‌দে শুষ্ক ঘাসের উপর, বৃক্ষ-গম্বুজ সকলের ঘোর সবুজ বর্ণ দাগ যেন স্থানে স্থানে অঙ্কিত। পূর্ব্বদিকে, নীল জলের তরঙ্গ ফিতাসকল গড়াইয়া গিয়াছে। ইতস্তত ক্ষেত্রের নীরবতার মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভ, তৃণপল্লবের

মধ্য হইতে কতকগুলি সৌধ-চূড়া মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। এই সমস্ত একটি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ। সে রাজধানীর আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। কেবল কতকগুলি অবিনশ্বর স্মৃতি-মন্দির বর্ত্তমান। এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কুজ্ঝটিকার ম্লান. আলোকে, তাজ-মর্ম্মরের ম্লান দীপ্তি, দূরস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতেছে।

নূতন অবতার।

প্রথম অঙ্ক।

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(স্বগত) তুমি রুদ্দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ! আচ্ছা দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে! ঐ পুকুরে দুবেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে! (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা ত সব শুনেছ দেখচি! সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপ্‌রি উপ্‌রি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখ্‌লুম—মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে' আমার শিয়রের কাছে এসে বল্লেন, ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল তাই তুই রুদ্দুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি! রুদ্দুর বক্‌শি কে তা জানিস্? সত্য যুগে যে ছিল ভগীরথ সেই আজ বক্‌শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগ্‌লি পুলের উপর দিয়ে যে দিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের

ঐ পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান হয়েছি।—তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ্‌রে! কি কাণ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কি না গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা! এমন পাপও করে! এখন বুঝ্‌তে পারচি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ্ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে! এ সমস্তই দেবতার কাণ্ড! তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মত বেরতে লাগ্‌ল—আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনও বুঝ্‌তে পারলুম না—মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকীলে লুটে খেলে! (অশ্রুবিসর্জ্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি সহকারে কলিযুগের ভগীরথ দর্শনে গমন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রুদ্রনারায়ণ বক্‌শী।

(স্বগত) তাই বটে!—ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল, যে, আমি বড় কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্চে। আর এও দেখেছি ব্রাহ্মণের ঐ পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল—থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত ও পুকুরটা কোন মতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্চে! একেবারে সাফ মনেই ছিল না, যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি! উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমা গুলো তার কাছে লাগে কোথায়!

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জান্‌তেম না? কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি—কি জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ত কারো ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।—কে গো তুমি? পায়ের ধূলো? তা এই নাও! (পদ প্রসারণ) তুমি কি চাওগা? পদোদক? এস, এস! নিয়ে এস তোমার বাটি—এই নাও—খেয়ে ফেল! ভোর-বেলা থেকে পদোদক দিতে দিতে আমার সর্দ্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।—বাছা, তোমরা সব এস কিছু ভয় নেই! এতদিন আমাকে চিন্‌তে পার নি সে ত আর তোমাদের দোষ নয়! আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না; যেমন চল্‌চে এম্‌নিই চল্‌বে—তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্দুর বক্‌শি বলেই জান্‌বে! (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে' দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না। কথাটা সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে! ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখ না হিন্দুপ্রকাশে কি লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট্‌ করে' সেই কাগজখানা নিয়ে আয়ত! এই দেখ—"কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী"—লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পর্শু দিনকার বঙ্গতোষিনীখানা আন্‌ দেখি তাতেও বড় বড় দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কি! খুঁজে পাচ্চিস্‌ নে? হারিয়েছিস্‌ বুঝি? হারায় যদি ত তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখ্‌ব না তা জানিস্‌! সে দিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে' দিলুম আলমারীর ভিতর তুলে রেখে দিস্‌! পাজি বেটা নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি, বের করে' দে! দে বের করে'! যেখান থেকে পাস্‌ নিয়ে আয় নইলে

তোকে পুঁতে ফেল্‌ব বেটা!—ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশ্‌-বাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে' শুনিয়ে দাও ত, আমার আবার বাঙ্গলা পড়াটা ভাল অভ্যেস নেই।—কে গা? মতি গয়লানী বুঝি? তা এস এস—আমি পায়ের ধূলো দিচ্চি—দুধের দাম নিতে এসেছ?—এখনো শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুয্যেকে মা গঙ্গা কি স্বপন দিয়েচেন সে সব খবর রাখ না! বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস্‌—সে জলের মাহাত্ম্য জানিস্‌? কেমন? সবার কাছে কথাটা শুন্‌লি ত? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধূলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট্‌ করে' একটা ডুব দিয়ে আয়গে যা!—

এই এখনি যাচ্চি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানিনে? ভাত খাওয়া হয়ে গেল? তা কি কর্ব্ব বল? লোক জন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধূলোর প্রত্যাশায় এসেছে এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে? আচ্ছা উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস্‌—যারা আমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে সব বসিয়ে রাখিস্‌ আমি এলুম বলে'। খবরদার দেখিস্‌ যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়! বলিস্‌ ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্চে। বুঝলি? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম বলে'।

রেখো, তুই যে একেবারে সীধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি? তোর কি মাথা নোয় না নাকি? তোর ত ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি! বেটা তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই! পাজি বেটা তোকে জুতো মেরে বিদায় করে' দেব তা জানিস্‌! সবাই আমাকে ভক্তি করচে আর তুই বেটা এত বড় খৃষ্টান্‌ হয়েছিস্‌ যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস্‌ নে! তোর পরকালের ভয় নেই? বেরো আমার বাড়ি থেকে!

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না? যে ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ ত? ভুল করচ—ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে' জেনো! বুঝেছ? মনে থাক্‌বে ত? ভগীরথ,—ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাষ্টারের কাছে পড়ে' নিয়ো! এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে দিই!

কই! ভাত কই! আমি আর সবুর করতে পারচিনে—দেশ-দেশান্তর থেকে সব লোক আস্‌চে! কি গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কি? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জলতোলা সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কি করব বল! আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে ত কাউকে বঞ্চিত করতে পারিনে! তা হলে আমি এত তপিস্যে করে' এত কষ্ট করে' গঙ্গা আনলুম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে—বটে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জান্‌তেন!—কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—তুই বিশ্বাস করিস্‌নে! জানিস্‌, তোকে বিয়ে করে' তোর চোদ্দ পুরুষকে আমি উদ্ধার করেছি! বাপের বাড়ি যাবে! যাওনা! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আস্‌তে দেব না! সেটা মনে রেখো!—ভাত আর আছে ত? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে' রাঁধতে বলে' দিয়েছিলুম! আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে' যে দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে! যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলবে না! রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এস—তোমরা সব চিঁড়ে আন্‌তে দাও—

পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো! কি করব বল! দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে তাদের ফেরাতে পারব না! কি বল্লে? আমার হাতে পড়ে' তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল? কি বল্‌ব, তুমি মূর্খ মেয়েমানুষ; ঐ কথাটা একবার দেশের ভাল ভাল পণ্ডিতদের কাছে বল দেখি! তারা তখনি মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন একথা কোন শাস্ত্রের সঙ্গেই মিল্‌চে না! তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চল্লুম! (বাহিরে আসিয়া) কিছু দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধুলো নিয়ে পূজো করে' বেলা করে' দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্ আর কাজ নেই—তারা কি ছাড়ে!—এস, তোমরা একে একে এস—যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও!—কিহে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা ত যেতে পারচিনে। দর্শন করতে সব লোকজন আস্‌চে। একতরফা ডিক্রি হবে? কি করব বল! আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপ্‌নে! তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলিনে? এম্‌নি করেই অধঃপাতে যাবে! আয়, এইখানে গড় কর্, এই নে, ধুলো নে! যা!

তৃতীয় অঙ্ক।

ওহে মুখুয্যে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রসি দুয়েক তফাতে এলেই ভাল করতেন। তুমি ত দাদা স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে, যে, দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগ্‌তে হচ্চে। এক ত, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ডাবে আর

পদ্মের পাতায় পচে' দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে--মাছগুলো মরে' মরে' ভেসে উঠ্‌চে—যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সে দিন মনে হয় যেন নরক-কুণ্ডুর দক্ষিণের জান্‌লা দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে—সাত-জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার যো হয়। ছেলেগুলো যে কটা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে; কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তা-রের ফি দিতে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হতে হল—তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখ্‌তে এলে পূরোভিজিট্ আদায় করে' ছাড়ে। সেও সহ্য হয়—কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ঐটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে—কাছাকাছি যে সমস্ত বসতি ছিল সে সমস্তই উঠে গেছে—রাত্তিরে যখন হরিবোল্ হরিবোল্ শব্দ ওঠে, এবং শেয়ালগুলো ডাক্‌তে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী ত বাপের বাড়ি চলে' গেছেন। বাড়িতে চাকরদাসী টিঁক্‌তে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দুপরে দাঁতকপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাইনে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুকের মধ্যে দুড়দুড় করতে থাকে—বাড়িতে জন-মানব নেই—গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে! আবার হয়েছে কি—ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়—সে দিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল তাদের কথাই বুঝ্‌তে পারিনে। বেটারা ভক্তি করলে বটে কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে! এখান থেকে উঠে গেলে হয় ত ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌তে সময় পাচ্চিনে—আমার পত্তনী তালুকটার খাজানা বাকী পড়েছে;

শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে, অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্চে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশি দিন বাঁচ্‌ব না। কি করি বল ত দাদা! রুদ্দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোন ল্যাঠাই ছিল না— ভগীরথ হয়ে কোন দিক্ সামলে উঠ্‌তে পারচিনে—আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে।—আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে—তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল্ আনবার জন্য উকীলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম—উকীল বল্লে তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্য যুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়—স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে শমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে' গেছে;—মতি গয়লানীর সঙ্গে একরকম ঠিক হয়েছিল আমি পদোদক দেব আর সে দুধ দেবে—আজ দুদিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারচি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধূলো ঝেড়ে যাবে, ভয়ে কিছু বল্‌তে পারচিনে। পুকুরটাত গেছেই, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়্‌বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চল্‌বে? রাস্তায় বেরলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে, যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।—এই ত বিপদে পড়া গেছে! দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখ্‌তে হচ্চে!

দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড় বড় ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যে রকম হয়ে এসেছে আর দুদিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে' ভেসে উঠ্‌বে; আমার মত ভগীরথ ঢের মিল্‌বে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টিঁক্‌বে কোন ডাক্তা-রেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে' ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারিনে। তাই স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসৎ করতে হবে!

কৌতুকহাস্য।

(পাঞ্চভৌতিক সভা।)

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্‌সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসি-য়াছে। সমীরণ চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসঙ্গত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পর-

স্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কি-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীরণ মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিত পশমরাশিপরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। সে চৌকিটা আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল— দূর হইতে একজন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোন একটা কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কি জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন;—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুক্‌রা আপ্‌না আপ্‌নি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোন একটা সঙ্গত উপলক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে!

সমীরণ নিঃশেষিতপাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল, কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসঙ্গত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না— কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক ত ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোন সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় আছে।

ক্ষিতি কহিল—রক্ষা কর ভাই! না ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট আছে আগে সেইগুলো শেষ কর তার পরে ভাবিতে সুরু করিয়ো। একজন পাগল তাহার উঠানকে ধূলি-শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঝাঁটা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল এই ধূলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিব্য একটি পরিষ্কার উঠান পাইবে—বলা বাহুল্য বিস্তর অধ্যবসায়েও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভ্রাতঃ সমীরণ, তুমি যদি আশ্চর্য্যের উপরিস্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ কর তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, কিন্তু সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।

সমীরণ হাসিয়া কহিল—ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমারই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও সৃষ্টির একটা মহা-শ্চর্য্য ব্যাপার মনে হইতে পারিত কিন্তু আরো ঢের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত তোমার সেই উঠানমার্জ্জনকারী আদর্শ-টির কল্পনা করিতে পারিতে না।

ক্ষিতি কহিল—মাপ কর ভাই; তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সেই জন্যই আমার মনে এতটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাটা এই যে, কৌতুকে আমরা হাসি কেন। ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহার পরের প্রশ্ন এই যে, যে কারণেই হউক্ হাসি কেন? একটা কিছু ভাল লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মু-

খের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মত ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসঙ্গত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অবমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন—আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভ্যসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—

সমীরণ ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল,—তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এই জন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেব্‌লামী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হুঁকা-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে—তবুও, যে, আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে ত কি? এই জন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ, ধর্ম্মবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই; অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য্য পরাভব, স্থৈর্য্যের এরূপ সম্যক বিচ্যুতি, মনস্বী জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল, সে কথা সত্য। কোন অখ্যাত-নামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

তৃষার্ত্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তিব তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোন ধর্ম্মসঙ্গত অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কি বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইরূপ—কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।

ব্যোম কহিল—প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চ-হাস্য হাসিয়া উঠি। ভৌতিক জগতে আলোক এবং বজ্র ইহার তুলনা। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক। আমি বোধ করি, যে কারণভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য এবং কৌতুকহাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।

সমীরণ ব্যোমের আজগবী কল্পনায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের

চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি তাহাকে আমরা আমোদ বলি না—কিন্তু যেদিন "চড়িভাতি" করা যায়, সেদিন নিয়মভঙ্গ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবতঃ অখাদ্য আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে তাঁহাকে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোন রসিকতা-বায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূম্রপিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক—চেতনাকে পীড়ন; আমোদও তাই। এই জন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য;—সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে উর্দ্ধে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।

ক্ষিতি কহিল, তোমরা যখন একটা মনের মত থিওরির সঙ্গে একটা মনের মত উপমা জুড়িয়া দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখ-জনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না - ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্য-তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্য্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অনতিদুঃখেরও নহে সেই জন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।

আমি কহিলাম, অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোন গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক

অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্ম্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখ-পীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দ্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন;—হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং কর্ণবধিরকর খোলকরতালের দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মত একান্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।

ক্ষিতি কহিল, বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও! কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে,—

ব্যোম কহিল—যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম কর আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—তোমরা কি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে?

ক্ষিতি কহিল, আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম, যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক্ হইয়া রহিল। কেবল সমীরণ কহিল, ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশবন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয়, না, ট্র্যাজেডির উপকরণ?

সঙ্গীতের গঠনরীতি

এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা।

আমাদের দেশে সঙ্গীত চর্চ্চার অভাব আছে বলিয়া দুঃখ করিবার ততটা কারণ নাই। তবে পরিমাণে যথেষ্ট হইলেও, চর্চ্চাটা যে ভাবে হইয়া থাকে তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে সকল বিষয়ে যেমন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে যাহা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত এবং তাহার উপর কোন কথাই চলিতে পারে না। যিনি যত বড় ওস্তাদ তিনি ততই এ মতের গোঁড়া, সুতরাং সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থা কি করিয়া ঘটিল, ইহা অপেক্ষা উন্নতি করিবার উপায় এবং আবশ্যকতা আছে কি না, কোন্ প্রণালী অনুসারে সঙ্গীতের ভাল মন্দ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত লোকেরা কোন আলোচনাই করেন না।

ওস্তাদরা যে বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছেন তাহা নহে। তাঁহাদের দুঃখ এই যে তাঁহাদের গুণপনা বুঝিবার মত যথেষ্ট সমজদার লোক নাই। এ কথা সত্য, কিন্তু অপরাধ কাহার? দেখিতে পাওয়া যায় বটে, যে, মজলিসে কালোয়াতি গানবাজনার আয়োজন হইলে, অনেকেই পালাইবার চেষ্টা করেন, যাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহারা শীঘ্রই হাই তুলিতে আরম্ভ করেন, এবং যেটুকু মাথা নাড়েন, সে কেবল গাইয়ের খাতিরে। কিন্তু সঙ্গীতের চির-বিখ্যাত মোহিনী শক্তির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল কি করিয়া?

মনোরঞ্জনই যে, সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা ওস্তাদের

বিস্মৃত হওয়াই, বোধ হয়, ইহার মূল। ওস্তাদরা চাহেন নিজের কারদানী দেখাইতে—কে, কত দ্রুতবেগে, রাগিণীর .বাদী বিবাদী সুর ঠিক রাখিয়া, সমে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, ইহাই প্রধান চেষ্টা ; শুনিলে মনে হয় সমে আসিবার দরুণ ঘোড়দৌড় পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ কস্‌রৎ প্রদর্শনে এক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং শ্রোতারও কতকটা আমোদ বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ শ্রেণীর ক্ষমতা বাজিকর আরও উত্তমরূপে দেখাইতে পারে, সুতরাং ইহার জন্য লোকে ওস্তাদের নিকট আসে না। ওস্তাদের নিকট লোকে ইহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর আনন্দ প্রত্যাশা করে।

শ্রোতৃবর্গ তবে কি পাইলে সন্তুষ্ট হন? কোন শ্রোতা গান বা বাজনা শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, আমরা বলি তাহার "ভাব লেগেছে", এবং যিনি কখনো এরূপ মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, এ অবস্থায় মনের মধ্যে কত রকম ভাবপ্রবাহ খেলিতে থাকে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমরা ভাব চাহি, এবং সঙ্গীতের হৃদয়গ্রাহিতা উহার ভাব উদ্রেক করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

ওস্তাদ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, গাইয়েকে উপযুক্ত কথা দিলে, তিনি তাহার দ্বারা ভাব উদ্রেক করিতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র 'গৎ-বাজনার দ্বারা ভাব ব্যক্ত হইবে কি করিয়া? বাজনার দ্বারা যে, নির্দ্দিষ্ট ভাববিশেষ প্রকাশ করা যায় না, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। বাজিয়ে যদি কোন একটি ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ, সে ভাব কোনো শ্রোতার মনের ভাবের অনুরূপ না হইতেও পারে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভাব প্রকাশের জন্য আমরা ভাষার আশ্রয় লইতে পারি, সে

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের বাজনার আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অথচ প্রোজ্জ্বল ভাব আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিয়াই বাদ্যসঙ্গীতের এত আদর।

এই ভাব প্রকাশের দরুণ যে, কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, এমন নহে। বাদ্যসঙ্গীত গঠনের নিয়মের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিলেই উদ্দেশ্য আপনিই সিদ্ধ হইবে। সঙ্গীত এমন সূক্ষ্ম রকমের জিনিষ যে উহাকে ভাষার দ্বারা ধরা কিছু কঠিন, সুতরাং উপমার সাহায্য লইলে কিছু সুবিধা হইবে।

ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আগ্রার 'তাজমহল' দেখিয়া সকলেরই ভাব লাগিয়া থাকে, অথচ কলিকাতার প্রকাণ্ড ইঁটের স্তূপ দেখিয়া, কাহারো মনে কোন ভাব উদয় হয় না। ইহার কারণ বাহির করা কিছু শক্ত কথা নহে -- চারিদিকের সহিত সামঞ্জস্য এবং গঠন-পারিপাট্যই তাজমহলের ভাব উদ্রেক করিবার ক্ষমতার মূল। শুধু স্থাপত্যে নহে, সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, গঠন-সৌন্দর্য্য মানুষের মনে নানা প্রকার ভাব উদ্রেক করিয়া থাকে।

গৎ-বাজনাতেও, ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, গঠনপারিপাট্য চাই। এবং অট্টালিকা-গঠনের সহিত বাজনার গঠনের কতক সাদৃশ্যও দেখা যায়। ভিত্তির আকারে যেমন ভাবী অট্টালিকার আকার সূচনা করা হইয়া থাকে, বাজনায় তেমনি আস্থায়ীর গঠনের অনুরূপ বাকি সমস্তটা গড়িতে হইবে। এবং ভিত্তির উপরিস্থ মহলে যেমন উহা অপেক্ষা কারুকার্য্য অধিক থাকে, অন্তরা, খাদ প্রভৃতিতে তেমনি, আস্থায়ী অপেক্ষা, রাগরাগিণীর সুরগুলিকে সূক্ষ্মভাবে খেলান হইয়া থাকে। আবার ভিত্তির সহ্যশক্তি বুঝিয়া যেমন সমগ্র অট্টালিকার গুরুত্ব ঠিক করিতে হয়,

সেইরূপ সমগ্র সঙ্গীতটার আয়তন এমন হওয়া উচিৎ নহে যাহাতে আস্থায়ী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, সুন্দর অট্টালিকা অথবা একটা সুন্দর বাদ্যসঙ্গীত কোনটারই গঠনপ্রণালী নিয়মবদ্ধ করিরা ফেলা যায় না, সে বিষয়ে কারিকর এবং ওস্তাদের প্রতিভার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে মনোযোগ না দিলেই নয়, তাহাই শুধু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অট্টালিকার সহিত বাজনার গঠনের একটু প্রভেদও এ স্থলে উল্লেখ করা ভাল। অট্টালিকার সমস্ত দৃশ্যটা চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে প্রসারিত থাকে, ইচ্ছামত উহার সৌন্দর্য্যসকল বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত উহাদের যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য অনুভব করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। বাজনার ঠিক বিপরীত। সেখানে প্রত্যেক অংশ, শ্রুত হইতে না হইতেই, লোপ পায়। কর্ণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বুঝিবার সময় পায় না, সুতরাং সমস্ত বাজনার ঐক্যবন্ধনটি ধরিতে পারে না। এই জন্য বাজনায় আবৃত্তি আবশ্যক। এই আবৃত্তি গঠন-সৌন্দর্য্যের বিশেষ সহায়তা করে, কারণ সুরটা একবার কানে বসিয়া গেলে পুনরাবৃত্তির সময়ে প্রত্যেক অংশকে আরো সূক্ষ্ম ও উত্তমরূপে ফলান যাইতে পারে এবং, সেই সঙ্গে, ভাবকেও, যেন ব্যাখ্যার দ্বারা, আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলা যাইতে পারে।

ভাল ওস্তাদ যে, বাজাইতে বসিয়া, এত ভাবিয়া, তবে একটি ভাল সঙ্গীত সৃষ্টি করেন, তাহা নহে। তিনি নিজ প্রতিভাবলেই প্রত্যেক অংশকে তাহার উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়া থাকেন। উল্লিখিত নিয়মগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আজকালকার অধিকাংশ ওস্তাদরা এগুলি পালন না করাতে, তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের বাজনা

ভাল হয় না। আমাদের দেশে যদি স্বরলিপি করিবার প্রথা থাকিত, এবং ভাল ওস্তাদরা যদি বাজনা তৈয়ারী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত—প্রত্যেক ওস্তাদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদগণের দোষ-গুণ বিচার করিয়া বিস্তর শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন, এবং অনেকে, নিজের রচনার ক্ষমতা না থাকিলেও, ভাল জিনিষ বাজান হইতে বঞ্চিত হইতেন না। এখন দাঁড়াইয়াছে এই যে, প্রত্যেক বাজিয়ে তাহার গতের টুকরা বা আলাপের মূল অংশ রচন করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মসকলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক—দেওয়া হয় না বলিয়া দেখা যায় যে বাজিয়ে কোন গতিকে একটা আস্থায়ী খাড়া করিয়া তুলিয়া সমে পৌছিতে পারিলে বাঁচেন, তাহার উপর, যেমন যেমন মনে আসে, ভাল মন্দ মাঝারি নানান টুকরা জুড়িতে থাকেন মাত্র—প্রত্যেকবার সমে ঠিক ফিরিতে পারিলে, মনে করেন যথেষ্ট বাহাদুরী হইল। রাগ, তাল প্রভৃতির সহিত এরূপ লঙ্কাকাণ্ডেই সাধারণ শ্রোতারা ভুলিয়া যান, মনে করেন বড়ই গুণপনা প্রকাশ পাইল—ইহা বুঝেন না যে, সহস্র বন্ধনের মধ্যে অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করাতেই অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সে যাহা হৌক, রাগিণীর মূল অংশের উপর টুকরা জোড়াতে কোন দোষ নাই, তবে প্রত্যেক টুকরা সমস্ত গঠনকল্পনাটির (designএর) অঙ্গস্বরূপ হওয়া উচিত, তাহারা নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত না হয়; নতুবা ভাবের একটা সমগ্র নিজত্ব (individuality) রক্ষা হইবে না। যে প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় সুসঙ্গত যুক্তির দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে, তাহাকে উপমা উদাহরণ প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত করিলে সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু যে প্রবন্ধের মূলে যুক্তি নাই, তাহাতে

অলঙ্কারের ছড়াছড়ি থাকিলেও, প্রবন্ধহিসাবে তাহার বড় মূল্য নাই। সেইরূপ যে বাজনায় আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি প্রধান অং-শের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহাতে মেলাই টুকরা জুড়িয়া কোন ফল নাই—একটা সুসংলগ্ন সঙ্গীত রচনার হিসাবে তাহার মূল্য থাকিবে না। বাজাইবার সময়েই যদি টুকরা তৈয়ারী করিতে হয় তাহা হইলে সাধারণ বাজিয়ের পক্ষে এত হিসাব করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বরলিপির ব্যবহার চলিত হইলে এই দোষের নিবারণ হইতে পারে। স্বরলিপিতে ওস্তাদরা আপত্তি করিয়া থাকেন যে মূর্চ্ছনা গমক প্রভৃতি কতক রকম অলঙ্কার, চিহ্ন দ্বারা বুঝান যায় না। এ আপত্তি খাটে যদি স্বরলিপিকে সঙ্গীতশিক্ষার উপায় বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু তাহা হওয়া উচিত নহে। শিক্ষার সময়ে ওস্তাদের স্থান আর কিছুতে অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু অলঙ্কারসকল কি করিয়া গলায় বা হাতে আনিতে হয় ইহা ওস্তাদের নিকট শিখিবার পর লিপিতে ইহাদের চিহ্ন দেখিয়া গাহিতে বা বাজাইতে কোন কষ্ট হইবার কথা নহে।

একটা গান অথবা বাজনার অংশসকলের মধ্যে একটা সং-যোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের বিশেষ সহায়তা করে বলিয়াই বোধ হয় রাগ রাগিণী জন্মিয়াছে। কোমল তীব্র প্রভৃতি যে ২২টি সুর লইয়া কারবার হইয়া থাকে, তাহার সব কয়টি ব্যবহার করিয়া কোন সুর রচনা করিলে ভাল শুনিতে হয় না, ইহা আদিম ওস্তাদরা, পরী-ক্ষার দ্বারা, জানিয়া থাকিবেন, সেই জন্য এই স্বরমালার মধ্য হইতে পরস্পরের সহিত বিরোধ নাই এমন ৭।৮টি করিয়া সুর বাছিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র ভাগ করা আবশ্যক হইল - এই ভাগগুলির নাম ঠাট। ইহার পর, তাঁহারা আরও দেখিয়া থাকিবেন যে দুই

ভিন্ন ঠাট লইয়া কোন সুরের দুই অংশ রচনা করিলে তাহাতে অনেক সময়ে রসভঙ্গ হয়, অতএব তাঁহারা একই ঠাট বজায় রাখিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এক এক ঠাটগঠিত সুরসকল এক এক রাগ বা রাগিণীর অন্তর্গত করা হইল। ইহাই বোধ হয় আদিম রাগ রাগিণী উৎপত্তির ইতিহাস। তাহার পর, এ নামকরণের প্রথা একবার চলিত হইলে, আবশ্যক অনাবশ্যক বিবেচনা না করিয়া ওস্তাদেরা নূতন নূতন রাগ রাগিণী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার ফল আজকাল অসংখ্য রাগরাগিণী গজাইয়া উঠিয়াছে। ওস্তাদমহলে আজকাল এইগুলিকে লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে সাধনাসম্পাদকমহাশয়ের কোন এক বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত ছত্র কয়টি উদ্ধৃত হইল।

"যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তি, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়! জয়জয়ন্তির কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকট অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তি বাঁচুন বা মরুণ, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন? আমি জয়জয়ন্তির কাছে এমনি কি ঘুস্ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব?"

ওস্তাদরা (এবং তাঁহাদের দেখাদেখি ছাত্রেরা) ভুলিয়া যান যে, রাগরাগিণী তাঁহাদেরই মত মানুষের মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব, মনুষ্যরচিত অন্যান্য জিনিষের ন্যায়, উহাদের দোষও আছে গুণও আছে, এবং সেইগুলি বিচার করিয়া, তবে

গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি খুব সুন্দর এবং সম্পূর্ণ, সেগুলিতে সংস্করণ করিবার আর বড় পথ নাই। কতকগুলি এত একরকমের যে, সেগুলিকে ভিন্ন নাম দেওয়া বাহুল্য এবং ব্যবহারে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম—তাহাতে সঙ্গীতের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা হয় মাত্র। কতকগুলির (যে গুলিতে ৩।৪ সুর লইয়া কারবার) অস্তিত্বের কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আবার এমন অনেক ঠাট আবিষ্কার করা যাইতে পারে যাহা অবলম্বন করিয়া সুর রচনা করিলে সে সুর, সকল হিসাবে ভাল হইলেও, কোন এক প্রচলিত রাগিণীর অন্তর্গত হইবে না। ওস্তাদরা এরূপ সুরকে অশুদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু এ হিসাবে দেখিতে গেলে কাফিকে অশুদ্ধ সিন্ধু, এবং রামকেলিকে খেলো ভৈরোঁ বলা যায়।

তাই বলিয়া আমরা রাগরাগিণীকে একেবারে উঠাইয়া দিতে বলিতেছি না। অঙ্ক কসিবার কতকগুলি নিয়ম বাঁধা আছে—কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার বেশি তাঁহারা অনেক সময়ে উক্ত নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া, অঙ্ক আরও সহজে এবং সংক্ষেপে কসিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কেহ দোষ দেন না, গণনা ঠিক হইলেই হইল, প্রণালী যত সহজ হয় ততই ভাল। তাই বলিয়া নিয়ম কেহ উঠাইয়া দিতে চাহেন না—যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহাদের নিয়ম ব্যতীত চলে না। সঙ্গীত রচনা কালেও, যদি কোন প্রতিভাশালী লোক, রাগরাগিণীর বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রচনা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে, বন্ধন রক্ষা হয় নাই বলিয়া, সে রচনাকে উপেক্ষা করাতে মূর্খতা প্রকাশ পায় মাত্র। অপর পক্ষে, যাঁহাদের ক্ষমতা কম তাঁহারা, এ বন্ধন না থাকিলে, হয়ত দিশাহারা হইয়া পড়িতেন—তাঁহাদের জন্য রাগরাগিণীরূপ বন্ধন থাকা অত্যাবশ্যক। আসল কথা,

রাগরাগিণীগুলিকে শ্রেণীবন্ধনের উপায় বলিয়াই দেখা উচিত। ইচ্ছা করিলে, আজ একজন ওস্তাদ, একটা নূতন ঠাট ও বাদী সুর, এবং সেই সঙ্গে একটা জাঁকাল নাম জোগাড় করিতে পারিলেই, নূতন রাগ বা রাগিণী গড়িতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ফল কি? আমরা নূতন রাগ চাহি না—আমরা চাহি নূতন সুর এবং সেইগুলির নামকরণের সুবিধার জন্য কতকগুলি আদর্শ (typical) রাগ থাকিলেই যথেষ্ট। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদি মনুষ্যজাতিকে গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন, তাহার পর ইংরাজদের ফ্যাটকেটে রং উক্ত কোন দলের মধ্যে না ফেলিতে পারিয়া উহাদের মনুষ্য নহে বলিয়া স্থির করিতাম, সে যে রকমের যুক্তি হইত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুরসকলকে কতকগুলো রাগিণীর অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া সে রাগিণীর অন্তর্গত না হইলে যে কোন সুর ধর্ত্তব্য নহে, ইহাও সেই রকমের যুক্তি।

আমরা সঙ্গীতকে স্থাপত্যের সহিত তুলনা করিবার সময়ে বলিয়াছিলাম যে, চতুর্দ্দিকের সহিত সামঞ্জস্য তাজমহলের ভাবোদ্রেক করিবার ক্ষমতার এক কারণ। গান অথবা বাজনার ভাবের সহিত সেইরূপ গায়ক বা বাদকের মুখের ভাব এবং অঙ্গভঙ্গীর সামঞ্জস্য থাকা চাই। বাজনার ভাব অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং বাদকের কোন বিশেষ ভাব ধারণ করিবার আবশ্যক নাই। তবে ভাবের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে হইলে ওস্তাদরা যে সকল কুৎসিৎ রকম ভঙ্গী করিয়া থাকেন, সেগুলো বর্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক।

"ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া, গলদঘর্ম্ম কলেবরে গান করিতে (অথবা বাজাইতে) বসেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন

করিয়া টিপিয়া ধরেন, ও ভাব বচারীকে এমন করিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়ান, যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড় কষ্ট বোধ হয়।"

বাজনা অপেক্ষা গানে এ বিষয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, কারণ গানে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভাব লইয়া কারবার। তবে এখানে স্বীকার করিতে হয় যে, এ কথা ওস্তাদী গান সম্বন্ধে খাটে না। ওস্তাদরা, গলাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে, এবং গানের কথাগুলিকে গলার আওয়াজকে বৈচিত্র্য প্রদানের উপায় মাত্র বলিয়া, গণ্য করেন, নিদেন সে হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাবব্যঞ্জক কথার ভাবকে পরিস্ফুটনার্থে তাহাতে উপযুক্ত সুর যোজনা করিলে, তবেই প্রকৃত পক্ষে গান হয়।

"সঙ্গীত আর কিছুই নহে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে, 'আমার আহ্লাদ হইতেছে,' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি, তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; যেমন মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে,' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয় তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীর সাহায্যে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি।"

প্রচলিত কালোয়াতি গানে কথার বড় অর্থ থাকে না, থাকিলেও ওস্তাদী উচ্চারণপ্রণালীর দরুণ তাহা বোধগম্য হয় না; আর যদি বা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় ত তাহার ভাবের সহিত সুরের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং ওস্তাদী গানকে অগত্যা গলা-বাজনার দলে ফেলিতে হয় এবং বাজনা হিসাবেই উহার দোষ গুণ বিচার করিতে হয়। গলাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে দেখাকে দোষ দেওয়া যায় না—কার্য্যটা কিছু অসঙ্গত হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে গলার গান গাওয়া রূপ অন্য কর্ত্তব্যটা লোপ পাওয়াটা দোষের

বিষয়। ওস্তাদমণ্ডলীতে প্রকৃত গানের চর্চ্চাটা না থাকাতে, যে, একটা মস্ত অভাব প্রকাশ পায়, তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে 'ওস্তাদী' ছাড়া অন্য প্রকার গান অনেক আছে এবং এই-গুলিকে বাস্তবিক গান বলা যাইতে পারে। কীর্ত্তন, বাউলের গান, রামপ্রসাদী গান, আধুনিক বাঙ্গলা গান (যাহার নমুনা সাধনায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া থাকে) প্রভৃতি নানা জাতীয়, নানা ভাবের গান ইহার দৃষ্টান্ত। যাঁহারা এই গানগুলি গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বড় ত্রুটি করেন না, সুতরাং শরীর ও মুখের ভঙ্গী সম্বন্ধে তাঁহাদের সাবধান করাইবার ততটা আবশ্যক নাই। তবে কতক বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে, গান কবিতা পাঠ করিবারই এক উপায় সেই জন্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে গলার স্বর কর্কশ না হয়, *কথা গুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, হাত পা নিরর্থক ভাবে না নাড়া হয়,* এ সকল বিষয় কবিতা পাঠকালে যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে গান গাহিবার সময়েও সেইরূপ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আবার কবিতায় ছন্দ অত্যাবশ্যক হইলেও পাঠের সময়ে যেমন হাতে তালি দিলে অদ্ভুত দেখায় গানের সময়েও সেইরূপ তবলায় বা হাতে তাল রাখিলে রসভঙ্গ হয়। একটা করুণরসাত্মক গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে থামিয়া, সঙ্গত-কারীর দিকে চাহিয়া, সমের স্থানে 'হা!' করিয়া উঠিলে লোকের যে হাসি পায় না, বা রাগ ধরে না, সে কেবল অভ্যাসের বশে। কিন্তু প্রকাশ্যে তাল দেওয়াতে দোষ আছে বলিয়া যে, গাহিবার সময় লয় না রাখিলেও চলে তাহা নহে। কবিতা ছন্দে না পড়িতে পারিলে যেরূপ দোষ হয় গানে লয় না রাখিতে পারিলে অনুরূপ দোষ হয়। কিন্তু লয় ঠিক রাখা যতটা আবশ্যক, তাল ঠিক

রাখাটা সেই পরিমাণে আবশ্যক কি না, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। যেমন সুর স্বাভাবিক কিন্তু রাগরাগিণী কৃত্রিম, সেইরূপ লয় * স্বাভাবিক কিন্তু তাল কৃত্রিম।

"ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভাল হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হইবে, সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। লয় ঠিক থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপর আরও কড়াক্কড় করা ভাল বোধ হয় না; তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ—হাজার অঙ্গভঙ্গী করিলেও একবিন্দু জল পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু সঙ্গীত কৌশলপ্রকাশের স্থান নহে, ভাবপ্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে, ততখানিই সঙ্গীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে মাত্র তাহা সঙ্গীত নহে, তাহার অন্য নাম। এক প্রকার কবিতা আছে তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায় উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়, সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্য উপযোগী, আর কোন উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সঙ্গীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্ত পদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়।"

তালকে কৃত্রিম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তবলায় বা হাতে

* 'লয়' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিতায় ছন্দ যে স্থান অধিকার করে, আমরা যাহাকে লয় বলিতেছি তাহা গানে সেই স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ তালের সম ও ফাঁক অন্য মাত্রা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান না করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাকেই আমরা এ প্রবন্ধে 'লয়' বলিতেছি।

বা নিদেন পক্ষে মনে তালের ঠোকাগুলো না দিতে থাকিলে, বেতালা হইল কি না ধরা যায় না। এ সকল কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য না লইলে, গানে তাল না থাকিলেও, কোন অভাব রহিল বলিয়া মনে হয় না। সুর অথবা লয়ের কিছু গোল হইলে, এ বিষয়ে যাহার কিছুমাত্র বোধ আছে, তাহার কানে তখনি সেটা ধরা পড়ে এবং বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় তাল, অর্থাৎ আবৃত্তির সময়ে একই স্থান প্রত্যেক বার সমে আনিয়া ফেলিবার নিয়ম রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অবশ্য তাল ঠিক রাখিয়া একটা সুন্দর সুর রচনা করিতে পারিলে তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, কিন্তু তালের খাতিরে সুর খর্ব্ব করিলে একটা অল্পমূল্য জিনিষ পাইবার জন্য অধিক মূল্যের জিনিষ পরিত্যাগ করা হয়—এ কার্য্য কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

'ওস্তাদী' এবং 'প্রকৃত' গানের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আমরা কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। একটা কথা বিচার করিতে এখনো বাকি রহিয়াছে অর্থাৎ গানে কি পরিমাণে অলঙ্কার দেওয়া যাইতে পারে। ওস্তাদ খেয়াল বা টপ্পা গাহিতে বসিলে, ঘণ্টা তিনেক তান না দিয়া তৃপ্ত হন না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে এরূপ করিলে গান মাটি হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বাজনায় অলঙ্কারের ভারে আদত জিনিষকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। গান সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। গানের মূল অংশকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া, তাহার পরিমাণ বুঝিয়া, তাহার ভাবের ব্যাখ্যা হিসাবে গোটা কতক বাছা বাছা উপযুক্ত তান দেওয়া উচিত। মূল সুরের সহিত সামঞ্জস্য, এবং সুর হিসাবে বিশেষত্ব তানের এই দুইটা সমান আবশ্যক। দ্রুত বেগে সা-ঋ-গ-ম সাধন করিলেই যে তান হইল এ ভ্রম অনেকের থাকিতে দেখা যায়। এই ত গেল ওস্তাদী গানের (অর্থাৎ গলা-

বাজনার) কথা। প্রকৃত ভাবের গানে তান আরও সন্তর্পণে দেওয়া উচিত। "কহে মিঞা তানসেন" এ কথাগুলি গাহিবার সময়ে "কহে মি " পর্য্যন্ত পৌছিয়া "হা হা· …" শব্দে একটা তান ছাড়িলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ, মিঞা তানসেন আকবর সাহের কি প্রকারে স্তুতি করিতেছেন, তাহা শুনিতে কেহ উৎসুক থাকে না। কিন্তু একটা ভাবের গানে কথাগুলি এরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিলে অর্থ বোধগম্য হইবে না। সুতরাং কথার ফাঁক বুঝিয়া তান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—যথা গানের দুই অংশের মাঝখানে অথবা দুই বার আবৃত্তির মাঝখানে। তাছাড়া এ সকল গানে শুধু "হা হা " শব্দে তান দেওয়া একটু অর্থহীন হয়, তাহা অপেক্ষা গানের কথার উপযুক্ত অংশ উচ্চারণ করিয়া তান দিলে বেশী সঙ্গত শুনাইবার কথা।

উপসংহারে আমরা ওস্তাদ নামের অধিকারী না হইয়াও যে এত কথা বলিলাম ইহার জন্য পাঠক সকলের এবং বিশেষরূপে ওস্তাদদিগের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। তবে একটা কথা আছে যে, যাহারা কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকে তাহাদের অপেক্ষা নিরপেক্ষ বাহিরের লোক অনেক সময়ে দোষগুণ বিচারে অধিক সমর্থ হয়, সেই ভরসায় আমরা উপরিউক্ত মন্তব্য সকল প্রকাশ করিলাম। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান সঙ্গীতচর্চ্চার কোন ত্রুটি ধরিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে ভরসা করি ভাবী ওস্তাদমণ্ডলী সেই-গুলির সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং যদি আমাদের যুক্তির কোন দোষ থাকে তবে বর্ত্তমান ওস্তাদমণ্ডলী আমাদিগকে সংশোধন করিয়া দিতে বিমুখ হইবেন না।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা।

ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মত এই যে, 'সংস্কৃত' ভাষা সমুদায় ভাষার মাতৃস্থানীয়া। এই নিমিত্ত তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে "দেবভাষা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কালক্রমে মানবগণের জ্ঞান ও বুদ্ধির হ্রাসের সহিত সংস্কৃত ভাষা অপভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। এই রূপান্তরিত অপ-ভ্রষ্ট ভাষাকে তাঁহারা "প্রাকৃত" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষার ১৬ প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অবন্তী (পালি), পৈশাচী, ওড্রীয়া ও প্রাচ্যা প্রভৃতি ভাষাই বিশেষ উল্লেখযোগ্যা।

কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে "মাহারাষ্ট্রী" ভাষাকেই বিশিষ্টতা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে,—"সর্ব্বাসু ভাষাসু ইহ হেতুভূতাম্ মহারাষ্ট্রভাষাম্ পুরস্তাৎ।" (প্রাকৃত কল্পতরু)। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ভাষাই (শৌরসেনা, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি) সকল ভাষার হেতুভূতা বা জননীস্বরূপা। তাঁহারা আরও বলেন,—"প্রাকৃতং মহারাষ্ট্র-দেশোদ্ভবং।" (সদ্ভাষা চন্দ্রিকা)। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশোদ্ভব ভাষা-কেই প্রাকৃত ভাষা বলে। পুনশ্চ,—"মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ। সাগরঃ শুক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ং॥" (দণ্ডী)। অর্থাৎ যে প্রাকৃত ভাষা মহারাষ্ট্রদেশে ব্যবহৃত হয়, তাহাই অনেকের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যেহেতু এই মহারাষ্ট্র-ভাষা সেতুবন্ধাদি কাব্যরূপ শুক্তিমুক্তাপরিপূর্ণ সাগরসদৃশ। মহাকবি কালিদাস মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় সেতুবন্ধ নামক এক উৎকৃষ্ট

কাব্য রচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে মাহারাষ্ট্রী ভাষায় "সপ্তশতী" নামক এক অতি উৎকৃষ্ট গাথাকোষ রচিত হয়। বাণভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থে এই সপ্তশতী গ্রন্থের বহুল প্রশংসা দৃষ্ট হয়। অতএব উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, সাগর যেরূপ মণিমুক্তাদি উৎকৃষ্ট রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, সেইরূপ মহারাষ্ট্রী ভাষা সেতুবন্ধ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য নিচয়ে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, এই প্রাচান মাহারাষ্ট্রী ভাষা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। (১)

এই গেল অস্মদ্দেশীয় প্রাচান বৈয়াকরণগণের মত। অধুনাতন কালের ভাষাতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অন্যবিধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত এই যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, সেই ভাষাই উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত হইয়া সার্থকভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগ যে ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ কথোপকথনের ভাষা হইলেও, উহা সেই অতি প্রাচীন সাধারণের কথোপকথনের ভাষা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগের ভাষা সমধিক পরিমার্জ্জিত। কিন্তু এই পরিমার্জ্জিত ভাষায় কেবল ব্রাহ্মণাদি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই কথোপকথন করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও এই পরিমার্জ্জিত ভাষায় রচিত হইত। লিপিপ্রণালী প্রচলন ও ব্যাকরণসূত্র বন্ধনে ভাষাকে সংযত করিবার চেষ্টার পর হইতে আর্য্য ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই বিভিন্ন পথে ধাবিত হইল। একভাগ উত্তরোত্তর মার্জ্জিত হইয়া সার্থক ভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিল। সাধা-

(১) সাহিত্য তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রণ লোকে সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথোপকথন করিতে লাগিল।

এইঅতি প্রাচীন সাধারণ ভাষা আর্য্যগণের রাজ্যবিস্তৃতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইতে লাগিল। আর্য্যগণ অনার্য্য দেশসমূহ জয় করিয়া, তথায় আর্য্যভাষার প্রচার করিতে লাগিলেন। অনার্য্য জাতির আর্য্য ভাষা বিশুদ্ধ রূপ উচ্চারণে অক্ষমতা ও তাহাদের উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্যবশতঃ, তাহারা আর্য্যভাষা কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। সেইরূপ আবার অনার্য্য জাতির সংসর্গে, অনেক অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় প্রবেশ লাভ করিল। এইরূপে অনার্য্য জাতির সংসর্গে এক আর্য্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাহ্যিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। ফলতঃ এক মূল আর্য্যভাষা হইতেই, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী, মগধে মাগধী, শূরসেনে শৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সাধারণ প্রাচীন আর্য্যভাষার উত্তরোত্তর উন্নতিতে যেমন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি, তেমনি উক্ত ভাষায় অনার্য্য সংসর্গজাত রূপান্তরে প্রাকৃত ভাষা সমুদায়ের উৎপত্তি (২)। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাসমূহে বহুদিবসাবধি নানা কারণে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া প্রচলিত ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ভাষাসমূহের মাতৃস্বসা।

এই মত সমধিক সমীচীন বোধ হয়। কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ যে, মাহারাষ্ট্রীভাষাকে প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, উক্ত ভাষা সেই আদিম আর্য্যভাষার প্রধান শাখাস্বরূপা ছিল,—হয়ত, অপরাপর ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী ভাষায় আদিম আর্য্যভাষা

(২) সাহিত্য তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অধিক পরিমাণে অবিকৃত ছিল ; এবং হয়ত সেই জন্যই প্রাচীনেরা মাহারাষ্ট্রী ভাষাকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। আদিম আর্য্য-ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী ভাষাও আমরা সবিশেষ অবগত নহি। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত মনে করি না।

প্রাচীন আর্য্যভাষা পরিমার্জ্জিত হইয়া সার্থকভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিলে ও উহা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিগণ সানন্দ-চিত্তে ঈশ্বরস্তোত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি এই মার্জ্জিত ভাষায় রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। (৩) তৎপরে এই ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত হইলে, প্রাকৃত ভাষাসমূহে নূতন সংস্কৃত শব্দগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। সংস্কৃত শব্দসমূহের সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশন শক্তিও তাহাদের প্রাকৃত ভাষায় সাদরে স্থানপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ। বোঁধ হয়, এই সকল কারণেই ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের প্রায় সকল-গুলিতেই বহুসংখ্যক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংস্কৃত শব্দগুলি প্রচলিত ভাষায় যেরূপেই প্রবেশ লাভ করিয়া থাকুক্, সকল ভাষায় তাহাদের অর্থ একরূপ নহে ; -বরং অনেক স্থলে এক সংস্কৃত শব্দ দুই ভাষায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেন এরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ও আধুনিক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ কতিপয় উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এথানে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিলে, পাঠকগণ আমাদের উক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

(৩) ঐতিহাসিক রহস্য তৃতীয় ভাগ পাণিনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতে যাহাকে কহে বর্ত্তমান (ক), মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার প্রচলিত অর্থ সংবাদ। ব্যঙ্গ—দোষ, ন্যূনতা। অভিধান শব্দ কেবল নাম অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিচারণ—জিজ্ঞাসা-করণ। সংবাদ,—কথোপকথন। সন্দর্ভ,—সুসঙ্গতি; সম্বন্ধ। মূলব্যাধি,—অর্শরোগ। বিলক্ষণ,—অদ্ভুত, অসাধারণ। বাচক,—পাঠক; (অন্যশব্দের সহিত যুক্ত হইলে) বোধক। কৢপ্তি,—ফন্দী, কৌশল। বিবেচন,—আলোচনা, বিচার। মূল পীঠিকা—আদি বিবরণ। প্রয়োজন (ক),—ভোজ; উৎসব। প্রান্ত (ক),—প্রদেশ। অঙ্কিত (ক)—অধীন, বশীভূত। ছল (ক),—যন্ত্রণা প্রদান। কোটি (ক)—যুক্তি Reasoning। লগ্ন (ক),—বিবাহ। ভাবিক,—ঈশ্বর-প্রেমিক। অনুভব,—পরীক্ষা। অনুভূয়মান,—পরীক্ষাধীন। কুটুম্ব.—স্ত্রী, পরিবার (family)। অনুবাদ,—কীর্ত্তন, অপরের বাক্যের অবিকল পুনরুক্তি। টীকা (ক),—সমালোচনা। সমারম্ভ,—সমারোহ, উপকরণ। সমাধান (ক),—মনোদুঃখ অপনোদন। শোধ (ক),—গবেষণা। শ্রমী (ক),—দুঃখিত, ক্লান্ত। মিতি,—তারিখ। পতঙ্গ (ক),—ঘুড়ি। উপরোধ—বাধা দেওয়া। নাটকশালা,—(ক), উপপত্নী। পুরস্কর্ত্তা,—প্রবর্ত্তক, নেতা, পৃষ্ঠপোষক। তিরস্কার,—ঘৃণা। অপেক্ষা (ক),—আবশ্যক। অনপেক্ষিত,—ইচ্ছাবিরুদ্ধ। মেষপাত্র,—ক্ষীণ প্রকৃতি, দুর্ব্বল। প্রয়োগ (ক),—অভিনয় করা। আর্জ্জব,—তোষামোদ, বিনয়। ব্যক্তি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও অপদার্থ ব্যক্তি। সত্তা (ক),—অধিকার, শাসন। অনুরোধ,—অনুসার। সবন্ধ,—সমগ্র, অখণ্ডিত। লোকগ্রহ,—সাধারণের সংস্কার বা ধারণা। সংস্থান,—দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট গ্রাম বা নগর। অঘোর—লোমহর্ষণ,ভয়ঙ্কর। মুহূর্ত্ত,—শুভক্ষণ। লেখ,—প্রবন্ধ, লিখিত বিষয়। উপনেত্র,—চশমা। উপন্যাস,—যুক্তি, তর্ক

উত্থাপন, ভূমিকা। বেধ,—চিন্তা। চেষ্টা,—Mischievous tricks, তাণ্ডব নৃত্য, ঠাট্টা করা। পরচক্র,—An invading army। ব্যতীপাত (ক),—সর্ব্বনেশে ছেলে। সরণী (ক),—তর্কপ্রণালী। নাদ (ক)—আসক্তি। ছন্দ (ক),—আসক্তি। সম্প্রদায় (ক)—রীতিনীতি। সাহিত্য,—উপকরণ। বন্ধু,—ভাই (cousin)। অর্থাৎ,—সুতরাং, প্রত্যুত।

এইরূপ আরও বহুতর শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে। (৪)

একই ভাব দুই ভিন্ন দেশে দুই ভিন্ন সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

প্রথমে বাঙ্গলার প্রচলিত শব্দ এবং তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীতে প্রচলিত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল।

বর্ত্তমান,—বিদ্যমান। উপযোগিতা,—উপযোগ। ব্যতীত,—ব্যতিরিক্ত। বৈরাগ্যশীল,—বিরক্ত। আধুনিক,—অর্ব্বাচীন। মনোমালিন্য, শত্রুতা—বৈমনস্য। অভিধান,—কোষ। জীবনী-লেখক,—চরিত্রকার। দুর্ভিক্ষ,—দুষ্কাল। প্রবন্ধ,—নিবন্ধ। কথোপকথন,—সম্ভাষণ। বিবেচনা,—বিচার। অচিন্তিতপূর্ব্ব,—অকল্পিত। ভদ্রলোক—প্রতিষ্ঠিত মনুষ্য, সভ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী,—প্রতিস্পর্দ্ধী। অনুবাদ,—ভাষান্তর। উপদেশগর্ভ,—উপদেশপর। চিন্তাকরণ,—মনন। অনেক,—পুষ্কল। কার্য্য,—কৃত্য। অগ্রহায়ণ,—মার্গশীর্ষ। বহুবচন,—অনেক বচন। চেষ্টা—প্রযত্ন, যত্ন। পথচলা,—মার্গ ক্রমণ। দুরাচার,—দুরাচারী। আত্মীয়,—আপ্ত।

---

(৪)—(ক) চিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেও কখন কখন সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই তালিকায় দেখান হইল যে, যে ভাবপ্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ সংস্কৃত শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই ভাব প্রকাশের জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তৎপর্য্যায়ভুক্ত অপর শব্দ-সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ভদ্রলোক' 'প্রতিদ্বন্দী,' 'কথোপ-কথন,' 'ব্যতীত' প্রভৃতি শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কথনও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। অনুবাদ, অভিধান, প্রবন্ধ, চেষ্টা, বিবেচনা প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে ভাষান্তর, কোষ, নিবন্ধ, প্রযত্ন, বিচার প্রভৃতি শব্দই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এইরূপ আরও অনেক শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

প্রচলিত ভাষাসমূহে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কালক্রমে সেগুলির অধিকাংশ উচ্চারণাদি-দোষে বিকৃত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল প্রচলিত ভাষাতেই এইরূপ রূপান্তরিত অপভ্রষ্ট শব্দ বহুল দৃষ্ট হয়। দেশকাল ও পাত্রভেদে একই সংস্কৃতশব্দ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহার্য্যশব্দগুলির কেমন রূপান্তর হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান গেল। এই সকল শব্দের মধ্যে হয়ত কতকগুলি সেই মূল আর্য্য ভাষার অন্তর্গত ছিল; পরে পরিমার্জ্জিত হইয়া "সংস্কৃত" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে সংস্কৃত, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয় ও তৎপার্শ্বে বাঙ্গালা দেওয়া গেল।

তুণ্ড, তোঁড্, টুঁড়। তণ্ডুল, তাঁদুল, চাউল। দাড়িম্ব, ডালিম্ব, ডালিম্ দাড়িম। যোগ্য, যোগা, যোগ্য। কুম্ভকার, কুম্ভার, কুমার। গ্রাম, গাঁও, গাঁ। হরিদ্রা, হলদ, হলুদ। স্তম্ভ, খম্ভ (খাম্ব;) খাম্। চর্ম্মকার, চাম্‌হার, চামার। স্থান, ঠাঁয়, ঠাঁই। গাভী, গায়, গাই। কার্পাস, কাপ্পাস (কাপুস), কাপাস। দধি, দহাঁ, দই।

গঠন, ঘড়ণ, গড়ন। বন্ধ্যা, বাঁঝ, বাঁঝা। সন্ধ্যা, সাঁজ, সাঁঝ। স্কন্ধ, খাঁদা, কাঁধ। লত্তা, লাৎ (লাথ), লাথি। অশ্রু, আসু, অশ্রু। গর্দ্দভ, গাঢ়ব, গাধা। জলৌকা, জলুঁ, জোঁক। গোধুম, গহুঁ, গম। উচ্চ, উঞ্চ, উঁচু। বহিঃ, বাহের, বাহির। ইত্যাদি।

আর কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ কেবল মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

প্রথমে সংস্কৃত শব্দ, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয় অপভ্রংশ।

করোটী, করণ্টী। অত্তিকা (পিসী), আত্। বিভ্রাট, বোভাট্। মন্যা, মান। লাক্ষা, লাখ। চিঞ্চা, চিঞ্চ। বদরী, বোর। বল্লী, বেল। বিতস্তি, বীৎ। পনস্, ফণস্। স্নুষা, স্থন। ইত্যাদি।

মন, দাঁত, নখ, জিভ্, নাক, কাণ, গাল, গলা, হাড়, মাংস, নথ, কপাল, হাত, কাঁথ, খুর, তেল, সকাল, ঘর, ভরম, খোঁচা, গাড়ী, ভুশি, পায়জামা (পারজমা), লবঙ্গ, মশলা (মশালা), মুলো (মুলা), বাঘ, সিংহ, হরিণ, ফুল, ফল, যব, দাড়ি (দাঢ়ী), ঘাম, মলা (মল), ঘোড়া, খাট, বাটি, কলসী, ভাত, রুমাল, দোকান (দুকান), টুপী (টোপী), দুধ, বাজার প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীর ভাষায় অভিন্ন। যে সকল শব্দের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে, সেগুলির মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত শব্দসমূহের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহাও অবধানযোগ্য।

প্রথমে বাঙ্গালা, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয়।

দিদী, জিজী। মেসো, মাওসা। ভাই, ভাউ। বোন্, বহিণ কড়ে আঙ্গুল, করঙ্গুলি। মা, আঈ। নাতি, নাতু। চোকের পাতা

পাপনী। পাকস্থলী, কোঠা। পায়ের তলা, তলওয়া। হাতের চেটো, তলহাত। পিঠ, পাঠ। বুক, উর। মণিবন্ধ, মণগট্। পা, পায়। মেদ মগজ, মেহু। কোমর, কম্বর। ওষ্ঠ, ওঁঠ। লোম, লঁও। পাট, পোট। স্বজনী, সাজনী। দেওর, দীর। ভাজ, ভাউজয়। জা, জাউ। ননদ, নণঁদ। জামাই, জাওঁই। বেহাই, ব্যাহী। বেহান, বিহিণ। আমি, মী। তুমি, তুহ্মী। তুই, তূঁ। আঁব, আঁবা। পেয়ারা, পেরু। লেবু, লিম্বু। নিম, লিম্ব। আলাই বালাই, অলাঙ্গী বলাঙ্গী। চুট্‌কীগল্প, চুট্‌কা। ছুতার, সুতার। যেথায়, জেথেঁ। সেথায়, এথেঁ। তথায়, তেথেঁ। কোথা, কোঠেঁ। ছোঁও, ছিও (শিও)। ছাড়, সোড়। ছাল, সাল। বাজাও, বাজীউ। রহিল, রাহিলেঁ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রচলিত ভাষাসমূহে সংস্কৃত শব্দ যেরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ঠিক সেরূপে না হউক, অন্য প্রকারে অনেক বৈদেশিক শব্দ ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অনার্য্য জাতির সংসর্গে প্রাচীন আর্য্য ভাষায় যেরূপ বহুল অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করে, মুসলমানগণের সংসর্গে সেইরূপ বহুল আরবী ও পারসী শব্দ সকল প্রচলিত ভাষাতেই প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী ভাষার তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আরবী ও পারসী শব্দের পরিমাণ অধিক।

স্বদেশভক্ত মহাত্মা শিবাজী স্বদেশের দুঃখমোচনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের জন্যও তিনি সেইরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহহেতু দেশমধ্যে যখন সর্ব্বত্র অশান্তি বিরাজ

করিতেছিল, সেই সময়ও শিবাজী মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে বিশেষ-রূপে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সংস্কারের উদ্দেশে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে অর্থ প্রদান করিয়া তৎকালপ্রচলিত যাবনিক শব্দসমূহের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত করাইয়াছিলেন। এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে যাবনিক শব্দসমূহ দূরীকৃত হইয়া তৎস্থলে নবগঠিত সংস্কৃত প্রতিশব্দ সকল যাহাতে ভাষায় প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যাবনিক ভাষার এক কোষ রচিত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে কতিপয় যাবনিক শব্দ ও মহাত্মা শিবাজার অনুমত্যনুসারে নির্ম্মিত তাহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ উল্লিখিত কোষ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম।

প্রথমে যাবনিক শব্দ, তৎপার্শ্বে সংস্কৃত প্রতিশব্দ।

সাহেব, স্বামী। মজুমদার, — দেশলেখক, অমাত্য। নাজীর, উপদ্রষ্টা। মুতালিক, উপমন্ত্রা। চৌকী, (বেত্রাসন) আসন্দিকা। ফতিলসোজ্ (ফিলসোজ) স্তম্ভদীপক। কার্‌খানা, সম্ভারগৃহ, কার্য্যস্থান। পোদ্দার, দ্রব্যপরীক্ষক। বেসর, নাসাপুষ্প। চাদর, প্রাবরণী। কুর্ত্তি, কর্পূরকঞ্চুক। ফতুয় -পান্থকঞ্চুক। তম্বু, দ্বাস্থুল। চোয়া, অগুরুসার। আতর, পুষ্পসার। গোলাপ, মকরন্দ। আরক, বস্তুসার। শিকারখানা, পক্ষিশালা। ডেরা, দুষ্যা (পটমণ্ডপ। সর্খেল, কার্যাস্থানাধিকারী; ধ্বজবৃন্দাধি-কারী। মখমল ইন্দ্রগোপ। হওয়ালদার (হাবিলদার), শস্ত্রাধি-কারী; কোষপাল, ব্যয়াধিকারী, রত্নাধিকারী; বসনাগা-রাধিকারী, আস্তরণাধিকারী; পত্তিপাল; মুদ্রাধিকারী; ধান্যাধি-কারী। বর্চ্ছি, শক্তি। বরকন্দাজ, নালীক। ফীলখানা, গজশালা হাওদা, গজাসন। লগাম, খলীনক। রেকাব, আরোহিণী। নাগার।

আনক। ঢোল, ভেরী। উজীর, সামন্ত। জুম্লেদার, শতাধিপ, পরি-স্তোমী। পঞ্চহাজারী, চমূপাল। ফৌজ, ব্যূহ। বারগীর, অশ্ববহ। সিপাহী, যোধ। পেয়াদা, পত্তি। সুভেদার, পদাতিগণের অধ্যক্ষ; দেশাধিকারী। গোঠ, শিবির। কুচ, প্রস্থান। মোকাম, অবস্থান। কিল্লা, দুর্গ। গড়, গিরিদুর্গ। কোঠ, প্রাকার। বুরুজ, কোটগুল্মক। খন্দক; পরিখা। মোর্চ্চা, উপসর্পণ। দফ্তর, লেখশালা। দফ্তর-দার, লেখক। কলমদান, লেখনপাত্র। ফর্ম্মান, রাজপত্রক। বাজে খরচ, অবান্তর ব্যয়। হিসাব, ব্যয় লেখন। জাবতা, দোষনির্ণয়-পত্রক। সেলাম, নমস্কার। কলম, লেখনী; প্রসঙ্গ। রুমাল, বেষ্টনবস্ত্র। মৌজা, গ্রাম। পরগণা, গ্রামগণ। বন্দর, বেলা-নগর। কোতয়াল, গ্রামরক্ষক। সাল মজকুর, বর্ত্তমানবর্ষ। হাশিল, সমস্ত আদায়। সের, কুড়ব। পোওয়া, পল। মণ, দ্রোণ। বাজার, পণ্যবীথিকা। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাত্মা শিবাজীর আদেশে সহস্রাধিক এইরূপ শব্দ ও বহুসংখ্যক গ্রাম্য অপশব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত হইয়াছিল। এই সকল শব্দ সংকলিত হওয়ার ৪। ৫ বৎসর পরেই মহাত্মা শিবাজী ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না। শিবাজীর পর তদীয় পুত্র কুলাঙ্গার সাম্ভাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অকর্ম্মণ্য সাম্ভাজীর দ্বারা মাতৃভাষার সংস্কার ও উন্নতি হওয়া যে অসম্ভব ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিবাজীর সময়ের স্বদেশভক্ত ও মাতৃভাষাভিমানী রাজকর্ম্মচারিগণও নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী সাম্ভাজীর হস্তে নিহত হইলেন। সম্ভাজীর পর রাজারাম। রাজারামের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল, পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, যুদ্ধবিগ্রহ ও নানাপ্রকার অশান্তিতে যাপিত হওয়ায় তিনিও ভাষা সংস্কারে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। শাহুর সুদীর্ঘ

রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ভাষার সেইরূপ উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শাহু বাল্যকালাবধি মোগল সরকারে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হওয়ায়, যাবনিক শব্দ ও চালচলন তাঁহার নিকট সমধিক প্রিয় বোধ হইত। এই কারণে তাঁহার শাসনকালে, ভাষার সংস্কার ও পরিপুষ্টির পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণে যাবনিক শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিল। এতদ্‌ব্যতীত শাহুর রাজত্ব কালে ও তৎপরবর্ত্তী কালে, মোগল-শাসিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, যবনসংসর্গে মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে যাবনিক শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। সুতরাং মহাত্মা শিবাজীর মূল সংকল্প তাঁহার বংশধরগণের দ্বারা সুসিদ্ধ হইল না। এই কারণে, শিবাজীর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় যাবনিক শব্দের এত বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র।

(পালামৌ)

কোন কোন ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কি একটি গ্রহ-দোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্ব্ব সাধা-রণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভাল গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সেস্থলে অনেক জিনিষ ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিষই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।

একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিবেন। "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র, যে ঘটনা-সংস্থান, প্রমাণবিচার, এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্ব্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত

তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।

"পালামৌ" সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন-সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না। বঙ্কিম বাবুর রচনায় যেখানেই দুর্ব্বলতার লক্ষণ আছে সেই খানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সঞ্জীব বাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য—তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না। তিনি যেন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছেন, দেখ বাপু, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা দিতেছি তাহাই গ্রহণ কর, বেশি মাত্রায় কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না।

"পালামৌ" ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে—কিন্তু তবু তাহার মধ্যেও নির্ব্বাচন এবং পরিমাণসামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝরনা যখন চলে তখন যে পাথরগুলাকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘনযোগ্য নহে তাহাকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যায়;—সঞ্জীব বাবুর এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা

পাশ কাটাইবার যোগ্য যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন "এখন এ সকল কচ্‌কচি যাক্।" কিন্তু এই সকল কচ্‌কচিগুলিকে সযত্নে বর্জ্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যে জন্য সঞ্জীবের প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই আমরা উপরে তাহার কারণ ও উদাহরণ দেখাইতেছিলাম, আবার যে জন্য সঞ্জীবের প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের যোগ্য তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।

পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাঙ্গলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্দ্ধক্যের লক্ষণ আছে—আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে—এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেই জন্য অশন বসন ছন্দ ভাষা আচার ব্যবহার বাসস্থান সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে এক যোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। "পালামৌ"তে সঞ্জীবচন্দ্র যে, বিশেষ কোন কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভালবাসিবার ও ভাল লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। "পালামৌ" দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্জল্যমান চিত্রের মত প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে

সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্ব্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্য্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিষটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ব-বৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোল-রমণীই হোক্, বনসমাকীর্ণ পর্ব্বতভূমিই হোক্, জড় হোক্, চেতন হোক্, ছোট হোক্ বড় হোক্ সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।

লেখক যখন যাত্রা আরম্ভকালে গাড়ি করিয়া বরাকর নদী পার হইতেছেন এমন সময় কুলিদের বালকবালিকারা তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লেখক বলিতেছেন "এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না;—সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল; অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল।"

সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু, তাহার উদ্দেশ্যবোধহীন অনু-করণবৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয়;—সেই একটি উল্টা-হাতপাতা ঊর্দ্ধমুখ অজ্ঞান লোভহীন শিশু ভিক্ষুকের চিত্রটি সমস্ত শিশুজাতির প্রতি আমাদের মনের একটি মধুররস আকর্ষণ করিয়া আনে।

দৃশ্যটি নূতন এবং অসামান্য বলিয়া নহে পরন্তু পুরাতন এবং সামান্য বলিয়াই আমাদের হৃদয়কে এরূপ বিচলিত করে। শিশু-

দের মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ইহারই অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেইগুলি বিস্মৃতভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল;—সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র সেই সকল অপরিস্ফুট স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীব বাবু তাহাই দেখিতেন—ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি সঞ্জীব বাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্ব্বে যে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নূতন লক্ষ্যগোচর বিষয় নহে, তাহার মধ্যে কোন নূতন চিন্তা, বা পর্য্যবেক্ষণ করিবার কোন নূতন প্রণালী নাই কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত সাহিত্যের অঙ্গ। গ্রন্থ হইতে আর এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন একদিন পাহাড়ের মূলদেশে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে একটা পোষা কুকুরকে ডাকিবামাত্র "পশ্চাতে সেই চীৎকার আশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্বদীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপব প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে।
* * ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ-কন্‌ডক্‌টর।"

ইহা বিজ্ঞান, এবং সম্ভবতঃ ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ইহা নূতন হইতে পারে কিন্তু ইহাতে কোন রসের অবতারণা করে না—আমাদের

হৃদয়ের মধ্যে যে একটি সাহিত্য-কন্‌ডক্‌টর আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না। ইহার পূর্ব্বোদ্ধৃত ঘটনাটি অবিসম্বাদিত ও পুরাতন, কিন্তু তাহার বর্ণনা আমাদের হৃদয়ের সাহিত্যস্তরে কম্পিত হইতে থাকে।

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার মতের স্বপক্ষে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেটি আমরা মূল গ্রন্থ হইতে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে;—জলে যে যাইতে পারিল না সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং-ফেরা দেখিতে যাইতাম।"

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়' আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে?" আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয় ত, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয় ত নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলি-

য়াও জল আনিতে যায় সাধারণের স্থূলদৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না। বাঙ্গলা দেশে অপরাহ্লে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া নামক সর্ব্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনার সৌন্দর্য্যকিরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্ত বর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের পরম লাভ। সম্ভবতঃ, সত্যের হিসাব হইতে দেখিতে গেলে অনেক মেয়ে ঘাটে সখীমণ্ডলীর নিকট গল্প শুনিতে বা কুৎসা রটনা করিতে যায়, হয় ত সমস্ত দিন গৃহকার্য্যের পর ঘরের বাহিরে জল আনিতে যাওয়াতে তাহারা একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া সুখ পায়, অনেকেই হয়ত নিতান্তই কেবল একটা অভ্যাসপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হয় মাত্র, কিন্তু সেই সকল মনস্তত্ত্বের মীমাংসাকে আমরা এস্থলে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। অপরাহ্লে জল আনিতে যাইবার যতগুলি কারণ সম্ভব হইতে পারে তন্মধ্যে সবচেয়ে যেটি সুন্দর সঞ্জীব সেইটি আরোপ করিবামাত্র অপরাহ্লের ছায়ালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুলবধূর জল আনার দৃশ্যটি বড়ই মনোহর হইয়া উঠে; এবং যে মেয়েটি জল আনিতে যাইতে পারিল না বলিয়া একা বসিয়া শূন্য মনে দেখিতে থাকে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর এবং আকাশের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে তাহার বিষণ্ণ মুখের উপর সায়াহ্নের ম্লান স্বর্ণচ্ছায়া পতিত হইয়া গৃহ প্রাঙ্গণতলে একটি অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই মেয়েটিকে যে সঞ্জীব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমরা লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সম্ভবপররূপে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি না এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব বাঙ্গলা দেশে সাধারণত সত্য কি না এবং সেই সত্যটি সঞ্জীবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। আমরা কেবল অনুভব করি ছবিটি সুন্দর বটে এবং অসম্ভবও নহে।

সঞ্জীব বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী, কিন্তু বৃক্ষপল্লব নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। * * * সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ।"

সঞ্জীব বাবুর এই মতটি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন—"সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।"

সমালোচকের এ কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অবলম্বন না করিলে সঞ্জীবের রচনার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না এ কথা যদি সত্য হইত তবে তাঁহার রচনা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হইত না। নদ নদীতেও সৌন্দর্য্য আছে, পুষ্পে নক্ষত্রেও সৌন্দর্য্য আছে মনুষ্যে পশু পক্ষীতেও সৌন্দর্য্য আছে এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম—সেই সৌন্দর্য্য ভূতের মত বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয় সে সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই।

এক জন নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন তাহার প্রিয়মুখকে চাঁদমুখ বলে তখন সে কোন বিশেষ তত্ত্ব না পড়িয়াও স্বীকার করে যে, যদিচ চাঁদ এবং তাহার প্রিয়জন বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তথাপি চাঁদের দর্শন হইতে সে যে জাতীয় সুখ অনুভব করে তাহার প্রিয়মুখ হইতেও ঠিক সেই জাতীয় সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমাদের মতভেদ কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম; তাহার কারণ এই, যে, এই উপায়ে পাঠকগণ অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন আমরা সাহিত্যকে কি নজরে দেখিয়া থাকি। এবং ইহাও বুঝিবেন, যাহা প্রকৃত পক্ষে সহজ এবং সর্ব্বজনগম্য আজকালকার সমালোচন-প্রণালীতে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পুরাতনকে একটা নূতন ঘরগড়া আকার দিয়া পাঠকের নিকট ধরিবার চেষ্টা করা হয়। ভাল কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না, সুন্দর হয় না অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে।

গ্রন্থকার কোল যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি;—"এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে। হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ

হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকল গুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

"সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।"

এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর ইহা ছাড়া আর কি বলিবার আছে! এবং ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই বা কি হইতে পারে! নৃত্যের পূর্ব্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনাশক্তি-প্রভাবে হয়, কোন বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয় না। "যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল" এ কথা বলিলে ত্বরিৎ আমাদের মনে একটা ভাবের উদয় হয়; যে কথাটা সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ঐ উপমা দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোলরমণীদের সর্ব্বাঙ্গে একটা উদ্দাম উৎসাহচাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম,

একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল—যদি আমাদের দিব্যকর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কল-কোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্যবাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রেই যৌবনসন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই যে একটা হিল্লোল ইহা এমন সূক্ষ্ম, ইহার এতটা কেবল আমাদের অনুমান-বোধ্য এবং ভাবগম্য, যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে "কোলাহলে"র উপমা অবলম্বন করিতে হয়, এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি এই উপমা দ্বারা লেখকের মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোন সার্থকতা নাই, তবে ইহা প্রলাপোক্তি মাত্র।

বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" বলিয়াছেন; সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাঁহাদের কোন বিশেষ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু এরূপ বিসদৃশ উপমা-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষিণ বায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার সেই সৌন্দর্য্যভঙ্গী আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্য্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠেন;—আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কি একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এই জন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে একটি অনির্দ্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুরভাবের

উদ্রেক হয় তাহা কোন বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না; অতএব দেখা যাইতেছে, অন্য সৌন্দর্য্যরাজ্যে সঞ্জীব বাবু তাঁহার নিজের রচিত একটা নূতন গলি কাটেন নাই, সমুদয় ভাবুক ও কবি-বর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।

সঞ্জীব একটি যুবতীর বর্ণনার মধ্যে বলিয়াছেন "তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।" এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড় একটি আনন্দের উদয় হয়; কেবল মাত্র উপমাসাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের সহিত আর কতকগুলি সৌন্দর্য্য জড়িত হইয়া যায়;—সে একটা ইন্দ্রজালের মত;—ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে, অপরাহ্ণের অতি দূর নির্ম্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থকিতগতি পাখীটিকে দেখিতেছি, না, যুবতীর শুভ্রসুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি যোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে!—জানি না, কেমন করিয়া কি মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূ-যুগল দেখিতে স্থিরদৃষ্টিকে বহু উচ্চে বহুদূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে - কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—"প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে; মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি

থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।"

আহারপরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ঐ যে মুখের সামনে একটা থাবা উল্টাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কিছুতে হইতে পারিত না। সজীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

দিবা রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি।

(প্রাচীন হিন্দু মত)

দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে কিরূপ ধারণা ছিল জানিতে স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত ঠিক্ রবিমার্গের সহিত এক সমতলে অবস্থিত নাই; পৃথিবী যে অক্ষরেখা বা ধ্রুবরেখার চারিদিকে ঘুরিতেছে, সেই রেখা ঠিক্ পৃথিবীর বার্ষিক ভ্রমণপথের উপর লম্বভাবে দাঁড়াইয়া নাই। পৃথিবীকে যদি একটি লাটিমের মত ভাবা যায়, এবং তাহার ভ্রমণপথ যদি টেবিলের পৃষ্ঠ ধরা যায়, তাহা হইলে যেন লাটিমের শলাকাটি ঠিক লম্বভাবে টেবিলের উপর না দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে ঈষৎ হেলিয়া আছে। বড় ঈষৎ নহে, এই অবনতির পরিমাণ প্রায় ২৩॥০ ডিগ্রি, প্রাচীন শাস্ত্রা-

নুসারে ২৪ ডিগ্রি। এই অবনতি না থাকিলে বারমাসই দিনরাত্রি সমান থাকিত, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। এই অবনতির জন্য সূর্য্য ছয়-মাস ধরিয়া নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও অপর ছয়মাস ধরিয়া নিরক্ষ-বৃত্তের দক্ষিণে থাকে। ১০ই চৈত্র তারিখে নিরক্ষবৃত্ত পার হইয়া ক্রমশ উত্তরবর্ত্তী হইতে হইতে তিনমাসে ২৩॥০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তর-বর্ত্তী হয়, ও ১০ই আষাঢ় হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে আর তিনমাসে অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন তারিখে আবার নিরক্ষবৃত্ত পার হয়। ঠিক্ সেইরূপে আবার ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত ছয়মাস নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে থাকে।

সূর্য্যের এই ছয়মাস উত্তরায়ণ ও ছয়মাস দক্ষিণায়ণের ফলে আমাদের দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটে। এইটুকু মনে রাখিলে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে কতদূরে থাকিলে পৃথিবীর কোন্‌খানে দিন কতবড় আর রাত্রি কতবড় হইবে, স্থির করিতে আর প্রয়াস পাইতে হয় না। কেবল একটা জ্যামিতির হিসাব আসিয়া পড়ে।

আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রেই জানে নিরক্ষবৃত্তে বার-মাসই দিবারাত্রি সমান থাকে সেখানে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আর উভয় মেরুতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি। এ সম্বন্ধে প্রাচীন-দিগের কিরূপ ধারণা ছিল দেখাইবার জন্য ভাস্করাচার্য্যের উক্তি গোলাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"যাবৎকাল সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরভাগে থাকে, তাবৎকাল উত্তরদেশে সূর্য্যোদয় নিরক্ষবৃত্তে উদয়ের একটু পূর্ব্বে ঘটে; ও সূর্য্যাস্ত নিরক্ষবৃত্তে অস্তের একটু পরে ঘটে।" (নিরক্ষবৃত্তে চির-কালই ৬টার সময় উদয় ও ৬টার সময় অস্ত হয়। সুতরাং নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে দিন বার ঘণ্টার অধিক হয়।)

"সূর্য্য যখন নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করে, তখন ঠিক্ ইহার বিপরীত ঘটে।"

"নিরক্ষবৃত্তের উপরে দিবারাত্রি সর্ব্বদাই সমান।"

"যে সকল স্থানের কুমেরু ও সুমেরু হইতে দূরত্ব ২৪ অংশের কম, সেই সকল স্থানে বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটে।"

"মনে কর কোন স্থান সুমেরু হইতে ১০ অংশ অন্তরে। নিরক্ষ-বৃত্ত হইতে সূর্য্য যতদিন ১০ অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তরে থাকিবে, ততদিন ধরিয়া সেই স্থানে সূর্য্যের অস্ত ঘটিবে না; ততদিন সেখানে রাত্রি ঘটিবে না। মেরুস্থলে এই নিমিত্ত ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি।"

"দেবগণ সুমেরুতে বাস করেন, ও কুমেরুতে দৈত্যগণের অধি-ষ্ঠান। নিরক্ষবৃত্তই তাঁহাদের উভয়ের চক্রবাল রেখা।"

(১০ই চিত্র হইতে ১ ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ছয় মাস সূর্য্য নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে, অর্থাৎ দেবগণের চক্রবাল রেখার উর্দ্ধে রহে। (চক্র-বালের নীচে যায় না, সুতরাং অস্তগত হয় না।) আবার (১০ই আশ্বিন হইতে ১০ চৈত্র পর্য্যন্ত) ছয়মাস সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে অর্থাৎ দৈত্যগণের চক্রবালের উর্দ্ধে রহে; (ও দেবগণের চক্রবালের নিম্নে রহে।")

সূর্য্য যখন দেখা যায়. তখন দিন, আর যখন দেখা যায় না তখন রাত্রি।" (অর্থাৎ চৈত্র হইতে আশ্বিন ছয়মাস সুমেরুস্থিত দেবগণের দিন আর কুমেরুস্থ দৈত্যগণের রাত্রি, এবং আশ্বিন হইতে চৈত্র ছয় মাস দেবগণের রাত্রি ও দৈত্যগণের দিন।)

বালকগণের পাঠ্য ইংরাজি পুস্তকে, অথবা তাহার তর্জ্জমা বাঙ্গলা পুস্তকে, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির এবং মেরুপ্রদেশে দিবারাত্রির অর্দ্ধ বৎসর ব্যাপ্তির কারণ যেরূপে সচরাচর বুঝান থাকে, ভাস্করা-

চার্য্যের প্রণালী তাহার অপেক্ষা কৌশলময় ও সরল। আমার বিবেচনায় শিক্ষক এই প্রণালী অবলম্বন করিলে সহজে বালকগণের হৃদ্গত করাইতে পারিবেন।

বৎসরের মধ্যে ছয়মাস (দক্ষিণায়ণ) ব্যাপিয়া দেবগণ নিদ্রিত থাকেন, ও ছয়মাস (উত্তরায়ণ) ব্যাপিয়া জাগ্রত থাকেন এইরূপ শাস্ত্রে লেখে। ইহার জ্যোতিষিক তাৎপর্য্য এইবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র, ইহারও মর্ম্ম সরল হইবে।

জ্যোতিষের মতে আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সুমেরুতে দেবগণের রাত্রি; আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে দেবগণের রাত্রি আষাঢ় হইতে পৌষ। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষের মতই অর্থযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিভেদটুকুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের প্রতি একটু তীব্রকটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।

ভাস্করাচার্য্য মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত স্থলে দিবারাত্রি পরিমাণ বাহির করিবার একটি সুন্দর হিসাব দিয়াছেন। সূর্য্যের বিষুবসংক্রমণের দিন (আজকাল যাহা ১০ই চৈত্র তারিখে ঘটে) সুমেরুতে প্রথম সূর্য্যোদয় ঘটে। তার পর এক মাসে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১১ অংশ ৪৫ কলা পর্য্যন্ত যায়; তার পর দ্বিতীয় মাসে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত যায়; তার পর তৃতীয় মাসে ২৪ অংশ (প্রকৃতপক্ষে ২৩ অংশ ২৮ কলা) পর্য্যন্ত যায়, তার পর আর উত্তরে যায় না; ক্রমে দক্ষিণবর্ত্তী হয়। দক্ষিণমুখে ফিরিবার সময় চতুর্থমাসে ২৪ অংশ হইতে ২০ অংশ ৪০ কলায়; পঞ্চম মাসে ১১ অংশ ৪৫ কলায়, ও ষষ্ঠ মাসে নিরক্ষবৃত্তে পুনরায় হাজির হয়। তখন সুমেরুতে সূর্য্যাস্ত ঘটে। সুতরাং

সুমেরু বিন্দুতে ছয় মাসই দিন; সুমেরু হইতে ১১ অংশ ৪৫ কলা দূরস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত (মানচিত্র অনুসারে গ্রীনলণ্ডের উত্তর ভাগ, স্পিট্জ্‌বর্জ্জন দ্বীপের অধিকাংশ প্রভৃতি স্থলে) ক্রমাগত চারিমাস ও ততোধিক কাল ধরিয়া দিন (আজ কাল ১০ই বৈশাখ হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত); সুমেরু হইতে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত দূরস্থ প্রদেশে (গ্রীনলণ্ডের মধ্যভাগ, নবজেম্লা দ্বীপ ও সাইবিরিয়ার উত্তর উপকূল) দুই মাসের অধিক কাল ধরিয়া দিন (১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত)। ফলতঃ সুমেরু হইতে দূরত্ব জানিলেই সেই স্থানের দিবাভাগের পরিমাণ অনায়াসে এই হিসাবে নির্ণীত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য এই হিসাবটুকু বাহির করিতে গোলমিতির (Spherical Trigonometry) সাহায্য আবশ্যক। ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে গোলতত্ত্বে সম্যক্‌ অভিজ্ঞতার অভাবে এই হিসাব দিতে গিয়া বড়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন, এবং তাঁহারা ভাস্করের তীব্র বাক্যজ্বালাময় আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই। ভাস্কর বলেন, যে জ্যোতিষী গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোলশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অবিদ্যমানে অপরকে শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল বিড়ম্বনা মাত্র। ভরসা করি ভাস্করের এই বাক্যে পাঠকগণের মধ্যে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবোত্তর বিষয়।

মাদ্রাজের ছয়জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া দেবোত্তর সম্পত্তির সদ্ব্যবহার নিমিত্ত এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার মন্ত্রণা করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে মাদ্রাজের গবর্ণর বাহাদুর

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত বিষয়ে এক আইন প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবকারীদিগের অভিপ্রায় এই যে, দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ১৮৬৩ সালের যে ২০ আইন প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা সমুচিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব এমন এক আইন হউক, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিজে কর্ত্তাস্বরূপ হইয়া জেলার জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা দেবমন্দির ও তৎসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার যথাযোগ্য বিচার করিয়া, প্রত্যুত্তরে শেষোক্ত গবর্ণমেণ্ট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের উক্তি এই ;—পাশ্চাত্য বিদ্যায় দীক্ষিত কতকগুলি ব্যক্তি এই আইনের প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দুগণ উহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ১৮৬৩ অব্দের ২০ আইনের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়া ১৮৮৮ অব্দে, গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণের সময়, ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উক্ত আইনে যে ব্যবস্থা আছে, দেবোত্তর সম্পত্তির পক্ষে সেই ব্যবস্থাই যথেষ্ট। সেই আইনমতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ পক্ষে যে কিছু ত্রুটি থাকে, তাহা পরিহার করা যাইতে পারে। সিভিল প্রসিভিওর কোড নামক দেওয়ানি কার্য্যবিধির ৫৩৯ ধারা সেই উদ্দেশে প্রণোদিত হইয়াছে। যেখানে দেব-সম্পত্তির সমুচিত সদ্ব্যবহার না হয়, সেখানে যদি কেহ সে বিষয়ের প্রতিকার ইচ্ছা করেন, তিনি উক্ত ধারা-মতে দেওয়ানি আদালতে তজ্জন্য নালিশ করিতে পারেন।

উক্ত মন্তব্য দ্বারা ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহা বিদিত করিয়াছেন যে, দেবোত্তর সম্পত্তির নিমিত্ত যে সকল আইন এক্ষণে প্রচলিত আছে,

দেশের লোক সমাজের হিতের নিমিত্ত কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলে ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা অবশ্যই অভিপ্রেত সাধন করিতে পারিবেন।

ভারতগবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে দেবোত্তরঘটিত তাবৎ ব্যাপারের অবস্থা বিলোকন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াছেন যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে এক একটী নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইলে সম্পত্তির পরিমাণানুসারে তাহার ফি দিতে হয়। তাহাতে অনেক টাকা লাগে। যাঁহারা স্বয়ং কোন সম্পত্তির ফলভোগী হইবেন, তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া মোকদ্দমা চালাইতে এবং তাহার আনুষঙ্গিক বহু খরচা দিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমুদ্যত হইবেন। কিন্তু দেবতার সেবা বা তাদৃশ ধর্ম্মোদ্দেশে যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অপচয় নিবারণ বা উদ্ধার সাধন করিতে লোক টাকা দিবে কেন? কেহ নিঃস্বার্থ হইয়া গ্রামস্থিত বা দেশস্থিত কোন দেবমন্দিরের বা মঠের অধিপতিদিগের অবিহিতাচার নিবারণ করিতে উদ্যত হইতে পারেন; কিন্তু নিজ কোষ হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা সকলের সাধ্যায়ত্ত হইবে না। বস্তুতঃ এই জন্যই উপরোক্ত আইন সকল সত্ত্বেও দেবোত্তর সম্পত্তির নানাবিধ অপব্যবহার নিবারিত হইতেছে না।

সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সমীচীন বিবেচনা সহকারে এই তথ্য অবধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর যদি ভারতবাসীরা যুক্তিযুক্তরূপে দাবী করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রকার মোকদ্দমার ব্যয় সংক্ষেপ করণার্থ যৎকিঞ্চিন্মাত্র ফি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে দেবোত্তর সম্পত্তির সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ১৮৬৩ সালের ২০ আইন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা হইবে না।

ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই যে অঙ্গীকার আছে, এই অঙ্গীকার পালন পক্ষে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দৃঢ়তা রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা এই সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের যোগ্যই হইয়াছে।

এখন এই দেবোদ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিয়াছেন, আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা আমরা সম্পাদন করিলেই সম্যক্ ফলোপধায়ক হয়। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আমাদের যথার্থ মনুষ্যোচিত কর্ম্ম চাহেন। আমরা যুক্তিযুক্ত মতে দাবী করিলে তবে তিনি দেবোত্তরঘটিত মোকদ্দমার কি খর্ব্ব করিবেন। আমরা যথার্থ সামাজিকতা এবং লোকহিতৈষিতা প্রদশন করিয়া মহন্তদিগের কৃত বা সেবাইতগণ কৃত দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে, গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত আইন রক্ষা করিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমরা কবিব কি?

যে কার্য্যে আমরা পটু—যাহা আমাদের অভ্যস্ত, তাহা তো করা হইয়াছে। তাহার ফলও যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমাদের "আবেদন ও নিবেদন থালা" একপ্রকার ফিরিয়াই আসিয়াছে বলিতে হইবে। এখনকার কর্ত্তব্য কি? আবেদনের পর অভিমানের পালা, এই কি আমাদের অদৃষ্টের লিখন? সত্য সত্যই দেখি, তাহাই যেন প্রতিপন্ন হয়।

প্রত্যাহত আবেদনকারীদিগের এখন অভিমানের পালা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে এত কথা বলিলেন, এত আশা ও ভরসা দিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্ট নাই। বালকের ন্যায় রোদন ও আবদার,—যাহা বলিয়াছি, তাহাই চাই; একটী আইন করিয়া দিতেই হইবে। এখনই দিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখান হইতেছে। গবর্ণমেণ্টে যে বলিয়াছেন যে, ১৮৬৩ সালের আইন দ্বারা কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমাত্মকতা প্রতিপাদন উদ্দেশে তৎসংক্রান্ত নানা চিঠিপত্র দেখান হইতেছে। আবার এই পুনরালোচনা দেখিয়া কেহ কেহ বিরক্ত বা শঙ্কাযুক্ত হইয়া বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, উত্তম হইয়াছে। বাবুরা পুনরায় গোলযোগ করেন কেন? এইরূপ সর্ব্ববিষয়িণী "কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা" আর তো শ্রুতি-যোগ্য হয় না। কেবল বাদানুবাদও শ্রেয়স্কর বোধ হয় না।

কথায় কথায় যে গীতটী স্মরণ হইল, তাহাতে আছে—"চোখে নাই কারো নীর।" কবির এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য বোধ হইতেছে না। এই লেখকের মত অধম লোকও যখন অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিল না, তখন অবশ্যই অনেকে কাঁদেন। কাঁদিবেন বৈ কি? ভারতের যে দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে দৃশ্যমান,—ধরাধরি করিতে করিতে যে দুর্গতি গভীরতর খাতের দিকে চলিল, তাহা উপলব্ধি করিলে কাহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া না উঠে। তজ্জন্য এই অশ্রুনীর একপ্রকার আবশ্যক বটে। সীতার নিমিত্ত রামচন্দ্র প্রথমতঃ বহুল শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াই সাগর বন্ধনের সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোদন মাত্র সম্বল হওয়া উচিত নহে।

প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্প্রতি যাঁহারা নিশ্চেষ্টতার পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ করি, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না যে, দেবোত্তর সম্পত্তির অপচয় হইতে কত অমঙ্গল ঘটিতেছে ও ঘটিতে পারে।

এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থপরায়ণ সাধু পুরুষদিগের শরীরধারণোপযোগী বৃত্তিবিধান জন্যই দেবোত্তর সম্পত্তি সকল প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা "ঠাকুর-ভোগ" বা দেবপ্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহণ

করিবেন না, এই জন্য দেবোদ্দেশে অন্ন নিবেদিত হয়। বিপুল সম্পত্তি বা রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন দেবতার ক্ষুধা নিবারণ জন্য নহে ; পরন্তু ভক্তের শরীর পোষণ নিমিত্ত। এই বিধানে সাধু তপস্বী-দিগের উঞ্ছবৃত্তি বা ভিক্ষাপ্রবৃত্তির কতক নিবৃত্তি করা হইয়াছে। আর এই প্রকরণে গৃহস্থের পক্ষে সাধুদর্শন, সৎসঙ্গ ও তজ্জনিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভের পথ কতক সুগম করা হইয়াছে। ইহার ব্যাঘাত ভারতের পক্ষে মর্ম্মাঘাত বা বজ্রাঘাত তুল্য। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে ও প্রাণপণে এই মহাধনের রক্ষা ও তাহার সার্থকতা সাধন করা উচিত। এ বিষয়ে কেহ দুটা কথা কহিলেও শ্রেয় জ্ঞান হয়। নিস্তব্ধতায় ও নিশ্চেষ্টতায় এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, আরো ঘটিবে। অতএব ভূয়োভূয়ঃ এই কথাই বলিতে হয়,—ইহাই ভাবিতে হয়, আমরা কি প্রণালীতে কার্য্য করিব ?

১৮১০ সালের ১৯ আইন, ১৮৬৩ সালের ২০ আইন, ১৮১৭ সালের মাদ্রাজ সংক্রান্ত ৭ আইন, প্রায় সকলেরই এক আশয় যে আমরা আপনা হইতে কিছু করিব। এখনকার গবর্ণমেণ্টও তাহাই চাহেন। যাঁহারা নূতন আইনের প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আশয় এই যে আমাদের ডিষ্ট্রিকট বোর্ড বা তদনুরূপ কোন সভা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করাইয়া লইবেন। প্রতিবাদকারীরা বলেন, আমাদিগের ডিষ্ট্রিকট বোর্ড বা অন্য সভা দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না।

তাহা হইলে কি করা উচিত ? প্রতিবাদকারীরা বলেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা হইবার, আপনা হইতে হইবে। কোন দেশে কোন কালে কোন স্থায়ী মহৎ কর্ম্ম "আপনা হইতে" নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা গত কালের ইতিহাসে নাই। ভবিষ্যৎকালে যে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে—অর্থাৎ আমরা নিদ্রার আরাম সুখ

উপভোগ করিতে করিতে মহৎ পদবীতে উন্নীত হইব, তাহার সম্ভাবনা অল্পই দেখা যাইতেছে। অতএব কর্ম্মই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়। চেষ্টা চাই, যত্ন চাই, সাধনা চাই। এই কালের প্রধান কথা সাধনা।

জল চলিতে থাকিলে তাহার মলা দূর হইয়া যায়। বদ্ধ জল দূষিত হইবেই হইবে। আমরা কর্ম্ম করিতে থাকিলে আমাদের সভা, সমিতি,—অনেকে এবং প্রত্যেকে, কালে সকল দোষ পরিহার করিয়া উঠিবে।

আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥

মনু ৯। ৩০০

এই তো আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি। কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য কর্ম্মারম্ভশালী তাহাকেই শ্রী সেবা করে।

এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা কার্য্য করি। পূর্ব্বতন ঋষিগণ যেরূপে তপস্যা করিতেন, আমাদের সাধনা তদনুগামিনী হউক। ঈশ্বর ফলদাতা। কেবল এই প্রস্তাবিত বিষয়ে কেন, ভারতের সকল অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট লাভ পক্ষে সাধনাই আমাদের কার্য্য। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তাহার সিদ্ধিদাতা।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে ইংরাজী ভাষায় রাজদরবারের আবেদনাদি কার্য্য একটু স্থগিত করিয়া মাতৃভাষায় সর্ব্বসাধারণের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করি।

(১) দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহারে আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে; (২) তাহার প্রতিকার জন্য আমাদের কতখানি সময় ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করা উচিত; (৩) গবর্ণমেণ্ট যে নিরপেক্ষতার মূলে কার্য্য করিতেছেন, সে মূল ধরিয়া তাঁহার আর আমাদিগকে কতদূর

চ

সাহায্য করা আবশ্যক; (৪) আমরা আত্মচেষ্টায় কি কি প্রতিকার সাধন করিতে পারি; (৫) আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কি কি প্রকারে পাইতে পারি;—এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেবোত্তরধারী ব্যক্তিদিগের অবস্থা ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা, তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করা এবং তৎ-প্রতি সাধারণ লোকের স্বপক্ষ হইতে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করা প্রথম আবশ্যক। বোধ হয় তাহা হইলেই সর্ব্বার্থসাধনপটু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে যোগ্যতা চাহেন, সে যোগ্যতা—সে শক্তি আমরা লাভ করিতে পারিব।

ইহা সত্য বটে যে, দেবোত্তর সম্পত্তি যত অধিক হউক, তাহা নিষ্কামভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সহিত বিবেচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। এই সম্পত্তির প্রকৃতি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে সর্ব্বসাধারণের প্রতীতি হইবে যে, ইহা ঐরূপ নিষ্কামী জনের পোষ-ণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উহা ব্যর্থ। তাহা তাদৃশ মহৎ লোকের শরীর রক্ষার উপযোগী হইবে এবং সেই সাধুগণ শরীরমাত্র ধারণ করিয়া নিষ্কামধর্ম্মেরই বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ইহাই উহার সার্থকতা।

সেই নিষ্কাম-দান-সমষ্টি এইরূপ নির্ম্মল-ভাব-প্রসূত হইলেও যখন তাহা অর্থে পরিণত হইয়াছে, এবং পরমার্থ-লক্ষণ হইতে একটু ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্যই পার্থিব অর্থযোগ্য শাসন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অর্থই অনর্থ, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। কোন প্রকরণে ইহা অন্যথাভূত হয় না। এই কামনাহীন দানের অর্থও সেই জন্য বিবিধ অনর্থের হেতু হইয়া পড়িতেছে। অতএব তাহাকেও অন্যান্য অর্থের ন্যায় নিয়মের ও শাসনের অধীন হইতে হইবে। তাহাতে প্রতিবাদ করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়া কিরূপে বিফলপ্রযত্ন হইতে হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহার সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার উদাহরণ, সপক্ষ ও বিপক্ষের ঘাত প্রতিঘাতে বারম্বার দেখা গেল। তাহা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান কালের সমুদ্যত কৃতী পুরুষেরা কি করিতে পারিবেন, তজ্জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন। বৃথা বাক্যের আর সময় নাই।

সমালোচনা।

উপনিষদঃ অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য একটাকা।

আমরা সম্পাদকোচিত সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকারকৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোন প্রকার ভ্রম অথবা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। তবে যখন সামশ্রমী মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত তখন আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক এই টীকা এবং অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারি। এই উপনিষৎগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সীতানাথ বাবু যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে জগতের এই প্রাচীনতম তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।

প্রবেশ লাভ করিয়াছি এ কথা বলা ঠিক হয় না। কারণ, এই প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত সংশ্লিষ্টভাবে প্রকা-

শিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, শ্লোকগুলি যেন কঠিন তপস্যার সংঘর্ষজনিত এক একটি তেজ-স্ফুলিঙ্গের মত ঋষিদের হৃদয় হইতে বর্ষিত হইতেছে—যে স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় দর্শন ষড়শিখা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল উপনিষৎকথিত শ্লোকগুলি সর্ব্বত্র সুগম নহে এবং বহুকালের পরবর্ত্তী কোন ভাষ্যকার, ঋষিদের গূঢ় অভিপ্রায় যে, সর্ব্বত্র ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন অথবা সক্ষম হইতে পারেন এরূপ আমাদের বিশ্বাস নহে; কারণ, অনেকস্থলেই শ্লোকগুলি পড়িলে, আর কিছুই ভাল বুঝা যায় না, কেবল এইটুকু বুঝা যায়, যে, সেগুলি নিগূঢ় এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত মাত্র। সেই সংকেতের প্রকৃত অর্থ তপোবনবাসী সাধক এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই ভাবার্থ ক্রমশঃ শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এবং কালভেদে মতের বিচিত্র পরিণতি অনুসারে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা। তাঁহারা যে শব্দ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন এখন আমরা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে সম্ভবতঃ তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এই জন্য সর্ব্বত্র আমরা ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না। অথচ অনেকগুলি উজ্জ্বল সত্যের আভাস আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলিকে যখন আপন মনে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করি তখনই সংশয় হয়, ইহার কতখানি বাস্তবিক সেই ঋষির কল্পিত এবং কতখানি আমার কল্পনা। একটি উদাহরণ দিলে পাঠকগণ আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

অথর্ব্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে আছে;—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া রয়ি (অর্থাৎ আদি-

ভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত (সংশ্লিষ্ট) যাহা কিছু এই সমস্তই রয়ি ; (তন্মধ্যগত) মূর্ত্ত বস্তু ত রয়ি বটেই।

বন্ধনী চিহ্নবর্ত্তী শব্দগুলি মূলের নহে। অতএব, পিপ্পলাদ ঋষি রয়ি এবং প্রাণ শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যকারকৃত অর্থের অনুবর্ত্তী হইয়াও যে, সর্ব্বত্র সমস্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না ; কারণ, আদিত্য-কেই বা কেন চৈতন্য এবং চন্দ্রমাকেই বা কেন আদিভূত বলা হইল তাহার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অথচ আভাসের মত এই তত্ত্ব মনে উদয় হয়, যে,—দুই বিরোধী শক্তির মিলনে এই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, ভাল ও মন্দ, চেতনা ও জড়তা, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার—রয়ি এবং প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হোক্ অস্পষ্টভাবে হোক এই মিথুন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রশ্নো-পনিষদের স্থানান্তরে রহিয়াছে শুক্লপক্ষ প্রাণ এবং কৃষ্ণপক্ষ রয়ি ; দিন প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। কর্ম্ম দ্বারা আমরা রয়িকে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রাণকে প্রাপ্ত হই।

যাহাই হোক, এই শ্লোকগুলি হইতে আমাদের মনে যে তত্ত্বটি প্রতিভাত হইতেছে তাহা এই উপনিষদের অভিপ্রেত কি না আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না— আর কাহারও মনে অন্য কোন রূপ অর্থেরও উদয় হইতে পারে।

অর্থ স্পষ্ট হোক্ বা না হোক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাঙ্গলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই অনি-র্ব্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে

ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোন ধর্ম্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্যদিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে; কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য্য। এই জন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নির্ব্বাক্ আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।*

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

---

* এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেনোপনিষৎ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।

ইহার তাৎপর্য্য এই—মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের উপরে উপনীত হয়। প্রাণ কাহার দ্বারা প্রৈতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের অভিমুখে গতিলাভ করিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রেরিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে যোজনা করেন।

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজীতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থ বিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাঙ্গলা রূপকথা (Folk lore), প্রবচন (Proverb) হরুঠাকুর রামবসু প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানসংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরের যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদকলিখিত ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে সকল ছত্র ভূদেব বাবুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করি।

"মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে

থাকে। অন্যদিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।"

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় য়ুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ীশিখার কিয়দংশ কোন উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙ্গালী লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্ত্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন—তাহা নহে। "ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্ব্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।"

বিস্তারিত ভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোন দেশের কোন প্রহসনেও এপর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ "নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত" হইয়াছিল, যদিচ "তখন ইংরেজী ভাবের প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল" এবং "বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল" কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাহিত্যপরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।

গার্গী।

হবির্গন্ধে আমোদিত স্নিগ্ধ তপোবন ;
পূতপ্রস্রবণে স্নাত তেজঃপুঞ্জকায়
তপস্বিনী বেদমন্ত্র করে অধ্যয়ন,
ললাট চর্চ্চিত শুভ্র চন্দনলেখায় ;
নয়নে শান্তির আলো সৌম্য সুনির্ম্মল,
উজ্জ্বল বক্ষের বিভা আবদ্ধ বল্কলে।
ঝিল্লিমুখরিতচ্ছায়া নির্ব্বাত নিশ্চল
বেদগানসমীরিত স্তব্ধ বনতলে
সন্ধ্যায় অঞ্জলি ভরি লয়ে অর্ঘ্যমালা
সাগ্নিক ঋষিরা বহ্নি প্রদক্ষিণ করে।
এ সময়ে একবার কর দেখি বালা
অগাধ বক্ষের ধ্বনি ধীরোদাত্ত স্বরে
শান্তি পাঠ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওম্ ;
শান্তিপরিপূর্ণ হোক্ যাগ যজ্ঞ হোম।

সাধনা।

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।

দক্ষিণাবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন—ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে;—আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয় সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুক্‌রা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্যঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হোক বা অদৃষ্টক্রমেই হোক্ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্যশক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত

প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম, ত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষ্যে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানা প্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সাম্‌নেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মত এক-

টুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা শাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহুযত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর পরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া ছুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না!

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে ছুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। ডাক্তার বলিল একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধ-ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগি-লেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন, যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবলমাত্র একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে, যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চ ভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিব না!

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্যআশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই, যে, তিনি আমাকে যুক্তঅক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক একদিন তাহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন চোখের সামনে কূল-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়মভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয়

নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণ-টাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমাব স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগি-লাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম—তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইযাছে। খানিকটা না বেড়া-ইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতি-দিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও। জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন;--

একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার

সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম; --সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ও কে?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে? ও কে গো? আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের

ডাক্তার বাবুর কন্যা! স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর!

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না; এ ওষুধটা ভারি বিষ। আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন। মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাঁকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মালক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, ডাক্তার বাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাঁকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন, আসুন না, আপনাকে নদীর

ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবল হইতে লইয়া দেখিলেন সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?—আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম। তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়োনা, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম। সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে

তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুরবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিলঅঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; - শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষ্যে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খড়ে' ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য চিহ্নশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই

রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ কবিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে একজায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই

বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকাশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল - ও কে? ও কে? ও কে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে - চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এত-রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল —ও কে? ও কে? ও কে গো?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া

হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না,—অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওকে, ওকে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কেগো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের

শিখাটা দপ্‌দপ্‌ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিস্‌ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্ট-সম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার! ডাক্তার!

সন্ধ্যা।

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে! রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ! হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল

স্তম্ভিত বিষাদে নম্র! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার!

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়!

অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,

দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত ! ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস !
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, - বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ !

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা ?" "আরো কত দূর ?"

৯ ফাল্গুন,
১৩০০।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্দ্ধারণ।

(প্রাচীন মত)

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্দ্ধারণ জ্যোতির্বিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা। এই দূরত্ব যে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা বোধ করি সাধারণ মানুষের কল্পনায় আসে না। অমুক গ্রহ এত-দূরে রহিয়াছে বলিলে বোধ করি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঁজাখুরি, তামাসা, অথবা কবিত্ব বলিয়া উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তবে যাঁহারা শাস্ত্রের ও বড়লোকের উক্তি বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সংখ্যার অল্পতা বা আধিক্য উভয়ই সমানভাবে জীর্ণ করিতে সমর্থ; তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির হজমি শক্তির সীমা নাই; তাঁহাদের অগ্নিমান্দ্যের কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গহন অরণ্য ভেদ করিয়া, অথবা অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইয়া, কোন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একটু স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কারের সহিত ইঁহাদের সম্মুখে হয় ত উপস্থিত হইলেন; খুসী হইলে ইঁহারা এত অকাতরে ও দ্বিধাহীন, অসন্দিহান চিত্তে সেই আয়াসলব্ধ তথ্যটাকে এমন চিরপরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, যে, বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের স্পর্দ্ধা একবার চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহাদিগকে প্রভূত পরিমাণে বিনয়-সম্পন্ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে বৈজ্ঞানিক গুরু সর্ব্বদা এরূপ বিনীত শিষ্যে প্রণয়বান্ হইতে চাহেন না।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নিরূপণের কথা। জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্র সব চেয়ে নিকটে। দূরে একটা গাছ থাকিলে যেরূপে তাহার দূরত্ব বাহির হয়, ঠিক্ সেই প্রণালীতে চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইতে

পারে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার লোকে চন্দ্রকে কোন্‌খানে দেখে ঠিক্ কর, ঠিক্ সেই সময়ে মক্কার লোকে চন্দ্রকে কোথায় দেখে ঠিক্ কর। কলিকাতা ও মক্কা এই দুই জায়গার দূরত্ব জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইবে। কলিকাতা ও মক্কা এই উভয় স্থান হইতে অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিয়া যে অবস্থিতির প্রভেদটুকু পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম Parallax, দেশী সংস্কৃত নাম 'লম্বন'। এই লম্বন নির্দ্ধারণ ব্যতীত দূরত্ব অবধারণের অন্য উপায় পাওয়া যায় না। সেকালেও এইরূপে চন্দ্রের উদয়কালে লম্বন নির্দ্ধারণ করিয়া দূরত্বের পরিমাণ হইয়াছিল।

কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস যদি চন্দ্রের দূরত্বের সহিত তুলনায় নগণ্য হইত, তাহা হইলে, চন্দ্রোদয়ের সময়, অর্থাৎ চন্দ্র যখন চক্রবালের উপরে রহে, তখন চন্দ্র আকাশের ঊর্দ্ধ বিন্দু (ইংরাজি zenith, সংস্কৃত স্বস্তিক) হইতে ঠিক্ ৯০ অংশ দূরে থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস চন্দ্রের দূরত্বের তুলনায় নগণ্য নহে, সুতরাং চন্দ্র প্রকৃত চক্রবাল ছাড়িয়া একটু না উঠিলে আমরা উদয় বুঝিতে পারি না। উদয়কালে স্বস্তিক হইতে দূরত্ব ৯০ অংশের কিছু কমই হয়। এই তফাৎটুকু চন্দ্রের তাৎকালিক লম্বন; তার পর পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব আপনা হইতে আসে। এই উপায়ে চন্দ্রের দূরত্ব সেকালে নির্ণীত হইয়াছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা; এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ আট শত যোজন; এই হিসাবে চন্দ্রের ভ্রমণ পথ ৩২৪০০০ তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার যোজন, ও চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৫১৫৭০ যোজন। আধুনিক কালে গৃহীত চন্দ্রের

দূরত্বের সহিত মিলাইতে হইলে এই যোজনের সহিত মাইলের সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। কিন্তু এই সূর্য্যসিদ্ধান্তের যোজন কয় মাইলের সমান, তাহা স্থির জানিবার কোন উপায় আছে কি না বলিতে পারি না। এই যোজন চারিক্রোশের সমান নহে তাহা নিশ্চিত; আর্য্যভট্ট যে যোজনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা চারি ক্রোশ পরিমিত, প্রথম প্রবন্ধে সেই যোজনের পরিমাণে পৃথিবীর পরিধি কত তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের আট শত ভাগের এক ভাগের নাম এক যোজন। এইরূপে যোজন পরিমাণ নির্দ্দেশ কিছু রহস্যজনক বলিতে হইবে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা এইরূপে তাহাদের metre স্থির করিয়াছিল। ফরাসীদের মীটার পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশের (অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু পর্য্যন্ত দূরত্বের) এক কোটি ভাগের এক ভাগ। যাহাই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ যোজন, ও পরিধি ৫০৫৯ যোজন। প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবীর পরিধি ইংরাজি মাইলের ২৫০৮০ মাইল। হইতে পারে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিধির যে পরিমাণ ধরিতেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার তাহা হইতে একটু ভিন্ন ধরিতেন। এমন কি ভাস্করাচার্য্যের নির্ণীত ভূপরিধির পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত পরিমাণের অপেক্ষা কিছু কম। সেকালে প্রাচীন শাস্ত্রের লেখা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়ার প্রথা ছিল না। প্রাচীন উক্তির সংশোধনে সেকালের লোকে সাহসী হইতেন। যাহাই হউক মোটামুটি ৫০৫৯ যোজন ২৫০৮০ মাইলের সমান ধরিয়া লইলে চন্দ্রের দূরত্ব ৫১৫৭০ যোজন প্রায় ২৫৫০০০ দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাইলের সমান দাঁড়ায়। ইংরাজি মতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৮৩০০০ মাইল। পাঠকগণ উভয় অঙ্কের তুলনা

করিবেন, ও সেই সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেকালের সহিত একালের একবার তুলনা করিতেও ভুলিবেন না।

চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইলে চন্দ্র কত বড় আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। চন্দ্র এত দূরে আছে, যে, উহার মণ্ডল আকাশের কেবল ৩১ কলা মাত্র স্থান (প্রায় সূর্য্যমণ্ডলের সমান) ব্যাপিয়া আছে। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ, যাহা ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, তাহার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন, সুতরাং চন্দ্রের ব্যাস ৪৮০ যোজন মাত্র, ত্রৈরা-শিক অঙ্কে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত হিসাবে ৪৮০ যোজন প্রায় ২৩৮০ মাইলের সমান; আধুনিক মতে চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল।

লম্বন অথবা parallax হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ও আয়তন নিরূপিত হয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা; আজ কাল স্থির দেখা গিয়াছে, চন্দ্রের লম্বন প্রায় ৫৭ কলা। এই ৪কলা পরিমাণের বিভেদের হেতু আধুনিক গণনার সহিত সেকালের গণনার যা কিছু প্রভেদ। অবশ্য সেকালের প্রাচীনত্ব ও যন্ত্রাদির অভাব বিবেচনা করিলে এই প্রভেদটুকু ধরি-বার মত নহে।

চন্দ্রের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা জানি চন্দ্রের কেবল একটামাত্র পৃষ্ঠ সর্ব্বদা পৃথিবীর অভিমুখে থাকে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এক চক্র ঘুরিয়া আসিতে আসিতে নিজের ধ্রুবরেখা বা মেরুদণ্ডের উপর তিন শত সওয়া ছষট্টি পাক আবর্ত্তন করে, চন্দ্রের পক্ষে তেমন নয়। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীর চারিদিকে এক চক্র ঘুরে নিজের ধ্রুব রেখার চারিদিকেও ঠিক্ সেই সময়ে এক পাক আবর্ত্তন করে। গোলাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি উক্তি দেখা যায়। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে, অর্থাৎ যে পৃষ্ঠ আমরা কখন দেখিতে পাই না, সেই পৃষ্ঠে পিতৃগণের বসতি। আমাদের অমা-

বন্যার দিনে পিতৃগণের মধ্যাহ্নকাল, সূর্য্য তাঁহাদের মস্তকোপরি, আমাদের পূর্ণিমার দিনে তাঁহাদের মধ্যরাত্রি; এক চান্দ্রমাসে তাঁহাদের এক অহোরাত্র। তাঁহাদের এক পক্ষ দিন, এক পক্ষ রাত্রি। বস্তুতঃই তাহাই।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত ছিলেন না,—কেবল আমরা চারি জন ছিলাম।

সমীরণ বলিল, দেখ সেদিনকার সেই কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা কিছু অদ্ভুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বুদ্ধি অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্‌ বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে কৌতুক তাহাদিগকে সহসা বিচলিত করিতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, প্রথমতঃ তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়তঃ অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্‌ শব্দটা ইংরাজি।

সমীরণ কহিল, প্রথম অপরাধটা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না, অতএব সুধীগণকে ওটা নিজগুণে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম, যাহারা দ্রব্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার গুণটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্যরসরসিক হয় না।

ক্ষিতি মাথা নাড়িয়া কহিল, উহুঁ, এখনো পরিষ্কার হইল না।

সমীরণ কহিল, একটা উদাহরণ দিই। প্রথমতঃ দেখ, আমাদের সাহিত্যে কোন সুন্দরীর বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিবার দিকে লক্ষ্য নাই; সুমেরু দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওয়া হয় এবং সুন্দরীমাত্রেরই প্রতি তাহার আরোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মত স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না—সেই জন্য কৌতুকের একটি প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভূত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্র গমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না। যখন একটা সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তখন সুন্দর উপমা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক; কারণ, উপমার কেবল সাদৃশ্য অংশ নহে অন্যান্য অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। "জ্যোৎস্নায় যেন ফুল ফুটিয়াছে" এমন কথা নিরক্ষর লোকের মুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু যদি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইত যেন ভাতের হাঁড়ি হইতে ফেন গলিয়া পড়িতেছে তবে সাদৃশ্য হিসাবে নিতান্ত মন্দ হইত না; অন্ততঃ শীতের হিম ও ধূমে আচ্ছন্ন পূর্ণিমাকাশকে বিশ্বকর্ম্মারচিত

একটা বড় গোছের দেব-রন্ধনশালা মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু তবু এ তুলনাটা গম্ভীরভাবে এবং সুন্দরভাবে কাব্যে ব্যবহার করিবার যোগ্য নহে, কারণ, এ তুলনায় সাদৃশ্য ব্যতীতও আরও এতগুলো ছবি মনে জাগিয়া উঠে যাহাতে সৌন্দর্য্যরসের ব্যাঘাত করে, এমন কি, হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই হাতির শুঁড়ের সহিত স্ত্রীলোকের হাত পায়ের বর্ণনা করা সামান্য দুঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাসিল না বিরক্ত হইল না; তাহার কারণ, হাতির শুঁড় হইতে কেবল তাহার গোলত্বটুকু লইয়া আর সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতাটি আছে। গৃধিনীর সহিত কানের কি সাদৃশ্য আছে বলিতে পারি না, আমার তদুপযুক্ত কল্পনাশক্তি নাই; কিন্তু সুন্দর মুখের দুই পাশে দুই গৃধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাড়তাও আমার নাই। বোধ করি ইংরাজি পড়িয়া আমাদের না হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকৃত হইয়া যাওয়াতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

ক্ষিতি কহিল,—আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেখানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে সেখানে কবিরা অনায়াসে গম্ভীর মুখে সুমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কারণ, অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্টের দেশে পরিমাণবিচারের আবশ্যকতা নাই; গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরও উচ্চ অতএব অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্ উচ্চতাটুকুমাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের সহিত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু যে হতভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উপমা শুনিবামাত্র কল্পনাপটে হিমালয়ের শিখর চিত্রিত দেখিতে পায়, যে বেচারা গিরিচূড়া হইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া

বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বড়ই মুস্কিল। ভাই সমীরণ, তোমার আজিকার এই কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে—প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি!

ব্যোম কহিল, কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরণের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বলা আবশ্যক। আসল কথাটা এই—আমরা অন্তর্জ্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করি না। যেমন ধূমকেতুর লঘু পুচ্ছটা কোন গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুচ্ছেরই ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহতভাবে অনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জ্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জ্জগতের রীতিমত সংঘাত কোন কালে হয় না; হইলে বহির্জ্জগৎটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রবল সত্য, তাহারা গজেন্দ্রগমনের উপমায় গজেন্দ্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না,—গজেন্দ্র বিপুল দেহ বিস্তার পূর্ব্বক অটলভাবে কাব্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে গজ বল' গজেন্দ্র বল' কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজ্বল্যমান নহে, যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে সুদ্ধ পুষিতে হইবে।

ক্ষিতি কহিল, আমরা অন্তরের বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের মত বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত "গোলা খা ডালা"—সেই জন্য গজেন্দ্র বল সুমেরু বল, মেদিনী বল কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জ্জগৎকে খাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে।

আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে—এ পর্য্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি এরূপ পরমাশ্চর্য্য ডিটেক্‌টিভ্‌ কল্পনা কেমন করিয়া যে কোন সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ।

ব্যোম কহিল, গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এই জন্য অত্যন্ত যত্ন-সহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন—নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ, আমরা সেই মূর্ত্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে-কোন একটা উপলক্ষ্য

অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীরণ কহিল,—যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষ্যটাকে সম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য্য বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্ত্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের স্বেচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য্যভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কখনই কোন অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পীড়া উৎপাদন করিত।

ব্যোম কহিল, আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চঅঙ্গের কলাবিদ্যার ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন কি, সৌন্দর্য্য-ভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে—কিন্তু সেই ভক্তি-ভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোন আবশ্যক করে না; এমন কি, ঘোরতর পশুত্ব থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা একদিকে স্বামীকে মানুষভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে আবার অন্যদিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া

আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে— এ পর্য্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি এরূপ পরমাশ্চর্য্য ডিটেক্‌টিভ্‌ কল্পনা কেমন করিয়া যে কোন সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ।

ব্যোম কহিল, গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এই জন্য অত্যন্ত যত্ন-সহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন—নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ, আমরা সেই মূর্ত্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে-কোন একটা উপলক্ষ্য

অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীরণ কহিল,—যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষ্যটাকে সম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য্য বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্ত্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের স্বেচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য্যভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কখনই কোন অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পীড়া উৎপাদন করিত।

ব্যোম কহিল, আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চঅঙ্গের কলাবিদ্যার ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন কি, সৌন্দর্য্য-ভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে—কিন্তু সেই ভক্তি-ভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোন আবশ্যক করে না; এমন কি, ঘোরতর পশুত্ব থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা একদিকে স্বামীকে মানুষভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে আবার অন্যদিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া

থাকে। একটাতে অন্যটা অভিভূত হয় না। কারণ, আমাদের মনোজগতের সহিত বাহ্যজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।

সমীরণ কহিল, কেবল স্বামীদেবতা কেন, পৌরাণিক দেবতাদের সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ দুই বিরোধী ভাব আছে অথচ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূরীকৃত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র কাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির উচ্চ আদর্শ সঙ্গত নহে, এমন কি, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সঙ্গীতে, সেই সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে—কিন্তু ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠিহাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে এক হাঁটু গোময় পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে সব কথা মনেও উদয় হয় না।

ক্ষিতি কহিল, আবার দেখ, আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে। যখন এটা বলি তখন ওটা মনে আনি না, যখন ওটা বলি তখন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতাবশতঃ ব্যোম যে সুবিধার উল্লেখ করিতেছেন আমি তাহাকে সুবিধা মনে করি না। বাহিরের সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া আমরা মনের সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্য্য ভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা

তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসঙ্গত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসঙ্গতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয়বৃত্তি সম্বন্ধে সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য্যরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু সে জন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি,—এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যুক্তির অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্য্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তিরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোন আবশ্যক বোধ করি না—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষে থাকি। সেইজন্য আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয়, একথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনিই আমাদের গুরু। হয়ত গুরু আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না, হয়ত আমার গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মকদ্দমার প্রধান মিথ্যা সাক্ষী তথাপি তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য্য—এরূপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্য ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না, দিব্য আরামে ভক্তি করা যায়।

সমীরণ কহিল—ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ।

বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণ পূজা প্রচার করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকে নির্ম্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কথা বলেন নাই যে, দেবতার কোন কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জ্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন;—তিনি পূজা বিতরণের পূর্ব্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।

ক্ষিতি কহিল—এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজাকে উন্নত হইবার, মূর্ত্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার আবশ্যক হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, সেই জন্য বিনা চেষ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তিবৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না। সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিষের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই এরূপ পরমসন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

আবদারের আইন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর গৃহে আসিয়াই এক উৎকট কর সংস্থাপনের উদ্দেশে একটী অভিনব আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুপ্রিম কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে এবারকার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য, সূতা ও কাপড়ের উপর কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলিপি। ইহা প্রবাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল; গবর্ণমেণ্ট পকেটে করিয়াই ইহা আনিয়াছিলেন; রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই রাজ্যমধ্যে এই পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। কয়েক দিন মধ্যেই পাণ্ডুলিপি পুরা আইনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইহার,—এই কাপড় ও সূতার শুল্ক-আইনের এক অংশে পুরাতনের ও পরিবর্জ্জিতের পুনঃপ্রচার; অপর অংশ সম্পূর্ণ অভিনব, তাহা একটী স্বতন্ত্র ও সাংঘাতিক আইন। শেষোক্ত প্রথমেরই অবশ্যম্ভাবী ফল;—উভয়ের একটীও কিন্তু অযাচিত নয়, আকস্মিকও নয়। অনেক সময়ে আকাশ হইতে আইন আসিয়া অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর পড়ে। আইনের আবশ্যকতা ও লোকের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সংবাদপত্র ও সভাসমিতির অজ্ঞাতে ও অনভিমতে নূতন নূতন আইন কানুন করিয়া থাকেন। বলা অনাবশ্যক ইহা অন্যায়, যথেচ্ছাচার, যার পর নাই দূষণীয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কারণেই হৌক, গবর্ণমেণ্ট আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিত ভাবে ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই। প্রত্যুত এ দেশে যাহা ও যাঁহারা সাধারণ অভিমতের অধিনেতা বলিয়া অভিহিত ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন,

তাহার ও তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে ও অস্বাভাবিক আবেদনে গবর্ণমেণ্ট এই আইন উপস্থিত করিবার অবসর পাইয়াছেন, উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। নহিলে এ আইন সম্ভবতঃ হইত না; সহজে হইবার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এ আইন করিতেন না, তাহা নহে; এ দেশীয় বস্ত্র-শিল্প অচিরাৎ উৎসন্নে যাইবে বা কাপড়-স্থতার কল শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন তাহাও নহে; পরন্তু এ দেশীয়দিগের পরিধেয়ের জন্যও যে পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এই আইন করিতেন না, এমনও বলি না। এ দেশের লোক অনাহার অর্দ্ধাহারে মরুক আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকুক বা এদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর গবর্ণমেণ্টের অবিচলিত ঔদাসীন্যের এক বিন্দুও উদ্বেগ উপস্থিত হইবার আদৌ কারণাভাব। কিন্তু, তথাচ এই আইন হইত না। হইত না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কারণ, সকলেই জানেন, মাঞ্চিষ্টারের মহিয়সী শক্তি, লাঙ্কাশায়রের বাণিজ্য-স্বার্থ। কিন্তু, শুনিতে পাই, মাঞ্চিষ্টার, লাঙ্কাশায়র আমাদের শত্রু। স্বীকারই করি উহারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর স্বার্থ সর্ব্বথা হননীয় শুক্রাদির নীতি অনুসারে ইহাও আসুন, স্বীকার করি। কিন্তু, এই শত্রুদিগের স্বার্থের অনুরোধে এ দেশীয় গরিব দুঃখীরা একটু সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত; পরন্তু, সেই স্বার্থেরই অনুরোধে, এ দেশের আধুনিক অনুষ্ঠান কলের কাপড় সুতার উপর এত দিন কোনও শুল্ক সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও অগত্যা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায়, শত্রুর স্বার্থে সাধারণতঃ এ দেশেরই সুবিধা ছিল, সরল ও সত্য কথা

বলিতে হইলে, অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্রে সুখও কিছু না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু, তথাচ শত্রু শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে। স্বদেশ-হিতৈষী সম্প্রদায়ের শত্রুহনন-স্পৃহা সমূহ বলবতী; তবে সে শক্তির অত্যন্ত অভাব বটে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে শত্রুহননের এক মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কি-জানি-কোন এক অজ্ঞাত অভিসন্ধি-সূত্রে এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান বণিকসম্প্রদায় মাঞ্চিষ্টারের স্বার্থের বিরুদ্ধে বন্দুকে সঙ্গাণ চড়াইয়া, বারুদবাহকের কার্য্য করিবার জন্য নেটিব পেট্রিয়টদিগকে ডাকিয়াছিলেন। সাহেবী ডাক; সামান্য নয়, অনুমার সম্ভ্রমেরই কথা। ডাক পড়িবা মাত্র পেট্রিয়টেরা, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বদেশের প্রকৃত, অতি প্রত্যক্ষ, ও অব্যবহিত, অস্থিমজ্জাময় শরীরী স্বার্থ আদৌ উপেক্ষা করিয়া, তাহার একটা মরীচিকা-কঙ্কালের কল্পনায় সাহেবদের পদ-প্রান্তে দলে দলে যাইয়া হাজির হন; বিদেশীয় ও বিলাতি আমদানি বস্ত্র এবং সূত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপনের জন্য, সজোরে ও সমস্বরে হল্লা করিতে আরম্ভ করেন। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানের বিলাতি বন্দুকে নেটিব পেট্রিয়টের বাক্য-বারুদ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা বিসম বিসদৃশ রাজনৈতিক আওয়াজ উৎপন্ন ও উৎসারিত করে। তাহারই ফল আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই আইন। ইতর কথায়, ইহাকেই বলে 'আপন নাসিকা কর্ত্তন করিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ'। শত্রুর শুভ যাত্রা ভঙ্গ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতে পারে; কিন্তু নিজের নাসিকাটিও ত নেহাত নিষ্কর্ম্মা দ্রব্য নহে। নাসিকাটীর কি একেবারেই কোন মূল্য নাই যে, নির্ম্মম হইয়া তাহাকে নির্মূল করিবে? কিন্তু, পরিতাপ এ দেশীয় পেট্রিয়টেরা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছেন, অথচ পূর্ণমাত্রায় তাহা কাহারও যাত্রা ভঙ্গের প্রতিবন্ধক হয় নাই। বিদেশীয় বস্ত্র-

শিল্পের শুভ যাত্রা সম্যক রূপে ভঙ্গ হইবে না; আদৌ এক বিন্দু ভঙ্গ হইবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; কিন্তু স্বদেশীয় সূত্র-শিল্পের ও সুলভ বস্ত্রের নাসিকাটী নিশ্চিন্তপুরে পলয়ন করিয়াছে। নাসিকা-ছেদনজনিত যন্ত্রণায় এখন রোদন করা বৃথা। যাতনার তীব্রতার সঙ্গে এক রত্তি তামাসাও আছে। নাসা না থাকা নিজেই এক তামাসা বটে; কিন্তু, এ ব্যাপারে তদতিরিক্ত আর একটু তামাসা আছে। নাসিকাটী কোথা হইতে কতখানি স্থান পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোন্ অঙ্গের হানি হইয়াছে কি না, আমাদের পরিচালক ও পেট্রিয়টবৃন্দ, তাহা এখনও নাকে হাত দিয়া দেখেন নাই। সেই সামগ্রীটী "গিয়াছে গিয়াছে," বলিয়াই কেবল রোদন ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন গেল, কাহার দোষে গেল, কত দূর লইয়া গিয়াছে, নাসিকা পুনঃপ্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই, তবুও ত এ সকল কথা এখন অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। অনর্থক চীৎকারে ও চাঞ্চল্য প্রকাশেই কি পুরুষার্থ?

গত বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষে লর্ড এলগিনের রাজত্ব আরম্ভ। তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ব্যবস্থাপক বৈঠকে বজেটের আলোচনা। অর্থের অনটন; অর্থাগমের অন্যতম উপায় উদ্ভাবন, — ট্যারিফ টেক্সের পুনঃ সংস্থাপন। ক'মাসেরই বা কথা; সকলেরই ইহা স্মরণ আছে এবং সে স্মৃতি এখনও খুব টাট্‌কা আছে। বিদেশ ও বিলাত হইতে আমদানি বহু দ্রব্যের উপর কর বসিল; কেরসিন তৈলের টেক্স বাড়িল। পেট্রিয়টগণ পুলকিত হইলেন। ইন্‌কম টেক্স বাড়িল না বলিয়া কেহ, নূতন টেক্স হইল না বলিয়া কেহ, বিলাতি দ্রব্যের স্পর্শে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে ও নরক গমন করিতে হইবে না বলিয়া কেহ, পরন্তু স্বদেশীয় শিল্পী ও

শ্রমজীবীদিগের সুবিধার স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কেহ; নানা জনে নানা অনুমানে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আনন্দের প্রকৃত কোনও কারণ ছিল না; রক্তমাংসময় পৃথিবীর সহিতও উহার সবিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। দেশের অনিবার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমেরিকার ইতিবৃত্তেই জ্ঞাতব্য। আনন্দই বটে! সে আনন্দে অস্ত্রনির্ঘোষ, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও শোণিত-স্রোতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু অঙ্গহীন অসাড় জাতির সবই উল্টা। পক্ষাঘাতে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই বিকল, কাযেই হর্ষ বিষাদের কারণ অনুভবে অক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ সূক্ষ্ম; সংসারের সংবাদ রাখেন তেমনি সবিশেষ; সুতরাং আমদানিশুল্কে উপরোক্ত আমোদ অনুভূত হইয়াছিল। সে আমোদের যদি একান্তই কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়—তাহার একটা কারণ হুজুগ; আর একটা কারণ "হবি" বাতিকের অশ্ব আরোহণ করিয়া অহরহ ইন্দ্রলোকে গমনের চেষ্টা। ইহাই "হবি"। সংসারে হবিওয়ালা লোকের অভাব নাই, হুজুগওয়ালা ত অসংখ্য। সুতরাং সেই জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ আমদানি-শুল্কে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নহিলে যাঁহারা সংসারের সবিশেষ সংবাদ রাখেন, বাজারের বৃত্তান্ত বুঝিয়া অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন এবং দেশের অস্থি মজ্জা মেধ, দরিদ্র রায়ত ও কৃষকের সুখ দুঃখের একটা অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের কেহই এই আমদানিশুল্কে সন্তুষ্ট হন নাই। উহাতে দেশের অন্তর্ভেদী একটী অসন্তোষই উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোক অদৃষ্টবাদী বল-ও-বাক-শক্তি-বিরহিত তজ্জন্যই এ অসন্তোষ অস্ফুট ও অব্যক্ত; সংবাদপত্রে উঠে নাই, বাগ্মীর বক্তৃতায় ফুটে নাই, বলে বণিকের পণ্য-পাট লুণ্ঠিত হয় নাই। লোকের বাক-

শক্তি ও বল থাকিলে ফল অন্যরূপ হইত। এই অন্তর্ভেদী অব্যক্ত অসন্তোষের কারণ অতীব স্পষ্ট। পেট্রিয়টিজিমের প্রিয় "হবি" যাহাই হউক, ইহা পরিষ্কার ও প্রতিদৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, স্বদেশীয় বা বিলাতি বিদেশীয়ও হউক, যে দ্রব্য জনসমাজে অনিবার্য্য-ভাবে চলিয়া গিয়াছে, যাহা জীবনধারণোপকরণের একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্ম্মান্তিক বাজে; বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটা দ্রব্যই গ্রহণ করুণ। প্রথম ধরুণ লবণ; লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয় ত মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্ততঃ ৭০ জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ। লবণ-শুল্ক অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সরকার বাহাদুরের একচাটিয়া হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে উহা শস্তা ছিল; তাহাদের অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা পারে না। ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানর ত কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিলে অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাৎ করে। ইহা কি খুব একটা সন্তোষের কারণ? স্বদেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতিই প্রশ্নটী করিলাম। কেহ কেহ হয়ত লুকাইয়া এক আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কি প্রচণ্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিশ রিটার্ণ ও ফৌজদারী রিপোর্টেই

প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ? পরন্তু ধরুন কেরসিন তৈল। কেরসিন তৈল ক্রমে এখন এ দেশের প্রায় আপাদমস্তক প্রচলিত হইয়াছে; কারণ তাহা অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শস্তা। তেলী নিজে সর্ষপাদির তৈল প্রস্তুত করে, তথাচ কেরসিন তৈল কিনিয়া পোড়ায়; কারণ তাহা শস্তা। দরিদ্রের দেশে শস্তা দ্রব্যেরই আদর; শস্তা দ্রব্যেরই আবশ্যক; তা দেশীই হউক আর বিলাতিই হউক; শস্তাতেই লোকের সুখ শান্তি সুবিধা। সুতরাং শস্তাগণ্ডাই গরিব লোকে দেখে; দেশী বিলাতি বুঝে না। ইহা স্বভাবের নিয়ম ও মনুষ্যপ্রকৃতি। তোমার পক্ষপঞ্জরবিহীন ও পুচ্ছহীন পেট্রিয়টিজম দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে যে যাও সে কেবল পাগলামি। নেহাত নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কেহই নৈসর্গিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই পেট্রিয়ট হও, দেশী দ্রব্য ও স্বদেশীয় শিল্পে যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তবে তাহার উন্নতিকল্পে আগে চেষ্টা কর; প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী দ্রব্যের দুর্মূল্যত্ব ঘুচাও; নহিলে তাহা কখনই গরিব লোকের ব্যবহার্য্য হইবে না; যে নিজে তাহা স্বহস্তে তৈয়ার করে, সেও তাহা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যাউক সে কথা। গত মার্চ মাসে টেরিফ-টেক্সের পুনরাবির্ভাবে কেরসিন তৈলের মাশুল বৃদ্ধি হইয়া তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। মাশুলের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; অত হিসাব করিয়া দেখি নাই। কিন্তু মূল্য বিলক্ষণই বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ তৈলের যে টিন ছিল ১।৵০ তাহা হইয়াছে এখন ১৸৵০; টিন প্রতি তন্মাধিক ।০ বৃদ্ধি। মধ্যবৃত্ত গৃহস্থেরই যখন ইহা মর্ম্মান্তিক বাজিয়াছে,

তখন গরিব ইতর সাধারণের আর কথা কি! যাহারা এক পয়সার তৈল কিনিয়া তিন রাত্রি পোড়াইত, তাহাদের সে তৈলে এখন পুরা দুই রাত্রিও চলে না। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, কেরসিন তৈলের এই "পোত" টা কি পরম সন্তোষেরই বিষয় হইয়াছে? এখন কেরসিন তৈলের দৃষ্টান্ত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করুন; ফল সেই একই হইবে। দেশী তাঁতের কাপড় অপেক্ষা বিলাতি বা বোম্বাই কলের কাপড় শস্তা। সঙ্গতিহীনে শস্তাই পরে। তাঁতি নিজহস্তে তাঁত বুনে; দেশী বস্ত্র তৈয়ার করে; কিন্তু পরে কি? পরে কি শিমলার কালাপেড়ে? না শান্তিপুরের কল্কাপেড়ে? কিম্বা ফরাসডাঙ্গার কাশীপেড়ে? সম্পাদক শিরোমণিরা নিজে এসব বরং পরিয়া বাহার দিতে পারেন। কিন্তু তন্তুবায় তাহা পারে না। তাহার প্রাণে পেট্রিয়টিজিম থাকিলেও হাতে পয়সা নাই। সুতরাং সে স্বহস্তে কল্কাপেড়ে প্রস্তুত করিয়াও পরিয়া থাকে বিলাতি কলের থানফাড়া ধুতি; কাপড় সূতায় শুল্ক বসিল, সে ধুতির উপর চাদর জুটা ভার হইবে। অনেকের ধুতিও জুটিবে না; লঙ্গটীতে লজ্জা নিবারিত যদি হইবার হন তবেই হইবেন; নহিলে লজ্জা নিজেই লজ্জা পাইয়া পলাইবেন। পরন্তু দেশীয় তাঁতির তাঁতের সম্বল বিলাতি সূতা; ইহাও বারেক স্মরণীয়। বিলাতি সূত্র-শুল্কে দেশী কাপড়ের উন্নতিকল্পনা আকাশকুসুমেরই অন্তর্গত।

বিগত মার্চের ট্যারিফটেক্সে অনেকানেক দ্রব্যের উপরেই আমদানিমাশুল বসিয়াছে। কিন্তু এখনও কতক দ্রব্য আছে, যাহাদের উপর হয় ত মাশুল বসে নাই; অথচ মূল্য তাহাদের বাড়িয়াছে। বাজারে যে দ্রব্যই দর কর সবই মহার্ঘ; বাণিয়া বলে "মহাশয় মাশুল বসিয়াছে; কাজেই মহার্ঘ"। ইহা বাণিয়ার

চাতুরী অথবা ট্যারিফ তহশীলদারদের বাহাদুরী ঠিক বলা যায় না। তবে ট্যারিফের নিয়ম গঠনেও যে গলদ্ আছে ইহাও নিশ্চয়। আইনের উপস্থিত সংশোধনে সে দোষ দুরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল করদ দ্রব্যের দুর্ব্বোধ্য ও অনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। পরন্তু কেবল ইণ্ডিয়া গেজেটে ট্যারিফের নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়া তাহা বড় বড় বন্দরে প্রেরণ করা প্রচুর নহে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর আমদানি মাশুল বসিল তাহা নির্দ্দিষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে বাজারে বাজারে প্রচার করা উচিত। নহিলে বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই সঙ্কট। এ বিষয়ে যে কেবল বড় বড় সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ক্ষুদ্র দোকানী পসারী ও দ্রব্যের খরচকারী ক্রেতা মাত্রেই ইহার সহিত জড়িত। অতএব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টল্যাণ্ড বাহাদুর যে কেবল ইণ্ডিয়া গেজেটের উপরেই নির্ভর করিতেছেন, * ইহা ঠিক নহে।

গত মার্চ মাসে অনেকানেক আমদানি দ্রব্যের উপরেই মাশুল বসিয়াছিল; -বসে নাই কেবল কাপড় ও সূতার উপরে। মাঞ্চেষ্টারের মাহাত্ম্যেই হউক কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক, সম্ভবতঃ মাঞ্চেষ্টারের মহিমাতেই, সেক্রেটারী-অব্-ষ্টেট কাপড় সূতার মাশুল অনুমোদন করেন নাই। নহিলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের তাহাতে সবিশেষ ইচ্ছা না ছিল এমন নহে। ষ্টেট-সেক্রেটারী মিঃ ফাউলার সাহেবকে তাঁহার উক্ত অনভিমতের জন্য অনেক নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হইয়াছিল। কাউন্সিলের প্রায় সকল

* মিং ওয়েষ্টল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বক্তৃতা; ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৪।

মেম্বরই তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সরকারী সদস্যেরা সাফই বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা হুকুমের চাকর সুতরাং কাপড় সূতার কর বসাইতে পারিলেন না। পরন্তু সাহেব সওদাগরেরা সাংঘাতিক রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটা অস্বাভাবিক আন্দোলন উঠাইয়াছিলেন। নেটিব পেট্রিয়টেরা যাইয়া সে আন্দোলনে যেরূপে যোগ দেন অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি। কাপড় সূতার করের অভিলাষে আন্দোলন ভয়ানক কাঁপিয়া উঠে। দেশীয় স্বদেশহিতৈষী ও সম্পাদকবর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠেন;—"ইহা ইংরাজের একান্ত অন্যায়, অপরিসীম অবিচার, পৈশাচিক অত্যাচার; সূতা ও কাপড়ের কর অবিলম্বে চাই, এখনি চাই; নহিলে দেশ এই দণ্ডেই উৎসন্নে যাইবে।"

আশ্চর্য্য! আমরা এরূপ আশ্চর্য্য আন্দোলন ও অভিমত খুব কমই দেখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক, সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র পথানুসারী সংবাদপত্র, এ সম্বন্ধে সকলেরই এক রায়;—"কাপড় সূতার কর না বসিলে ভারতভূমি অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবে।" ঘোরতর কংগ্রেসবাদী "বেঙ্গলী" হইতে কংগ্রেসের বিকট বিদ্বেষী "বঙ্গবাসী" পর্য্যন্ত উভয় শ্রেণীর স্বদেশভক্তই এ ক্ষেত্রে একাসনে উপবিষ্ট! তৈলে জলে দুগ্ধ শর্করবৎ সংমিশ্রণ! অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ অস্বাভাবিক একাকার আমরা আর কখনও দেখি নাই। এরূপ প্রকাণ্ড প্রমাদও আর কখনও দেখি নাই।

আন্দোলনের তুফান উঠিল। কয়েক মাস ধরিয়া আরজী ও আবেদনের ফুটকড়াই ছুটিল। সহস্র সহস্র স্বাক্ষরপূর্ণ সুদীর্ঘ আবেদন বিলাতে প্রেরিত হইল। স্বাক্ষর গ্রহণের সীমা ছিল না; দিগ্বিদিগ বিচার ছিল না; অজ্ঞানে সজ্ঞানে যেমনেই হউক দস্তখত

হইলেই হইল। দস্তখত সংগ্রহের জন্য দস্তরমত কমিসন কবুল করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোনও পেট্রিয়ট তাঁহার আপিসের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন!

বৃটিশ সিংহ আন্দোলন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যই করুন, একান্ত উপেক্ষা করেন না; দৃশ্যত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেও তাহাতে করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া থাকেন; ঈষৎ মাত্রায় আশঙ্কিতও না হইয়া থাকেন এমন নহে। মৌলিক হউক বা মেকিই হউক "পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক পদার্থমাত্রই অবিকৃত বিলাতি ধাতুতে 'সূচিকাভরণ' স্বরূপ। এ লক্ষণ সাধারণতঃ সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোনও কোনও সময়ে যে তদ্দারা সুবিধার পরিবর্ত্তে অসুবিধাও হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। সেটা 'পাবলিক ওপিনিয়ন' প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের পাপনিবন্ধনই ঘটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। বৃটিশ সিংহ বাহিরের কোলাহলে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন; এ কথা লর্ড এলগিন, সিংহশক্তির সামঞ্জস্য ও তৎকৃত কার্য্যমাত্রের মাহাত্ম্য বা প্রমাদরাহিত্য প্রতিপাদনার্থে অবশ্যই বলিতে পারেন; - আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার দিন ইহা বিশিষ্টভাবে বুঝাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। * কিন্তু তাই

* লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাকিঞ্চাবের হষ্ট সিদ্ধিব আরোপিত পক্ষপাতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, It is alleged in certain quarters · · that in consenting to introduce this Bill in its present form the Government has made a cowardly surrender to a pressure which if not unconscious is at any rate unusual and oppressive. I wish to take exception to any such statement. ইত্যাদি।

বলিয়া কথাটা অখণ্ডভাবে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কাপড়ের কর আন্দোলন ব্যতীত আদৌ জন্মিত না; পূর্ব্বাপর ঘটনাতেই ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

ঐ কর সংস্থাপন কামনায় সাহেব সওদাগরদিগের সংগ্রামের সহিত দেশীয় স্বদেশহিতৈষীদিগের সংযোগে ভারত গবর্ণমেণ্ট না হউন বৃটিশ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এবং অচিরাৎ বিলাতি আমদানি কাপড় সূতার উপর কর না বসিলে অসন্তোষের উগ্র অনলে ভারত রাজ্য দগ্ধ হইবে, বিলাতে ও ভারতে এই অমূলক অলীক কথাও অপ্রকাশ ছিল না। তৎকালে ঐ অসন্তোষ আস্ফালিত করিবার এক হাস্যকর অতি বৃহৎ সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ট্যারিফ আন্দোলনের সময় উত্তরবিহারের আমবাগানে এক আমোদ উপস্থিত হয়। সকলেরই স্মরণ আছে সে আমোদ কি; - বৃক্ষে বৃক্ষে কর্দ্দমাক্ত কেশ শোণিত সংপৃক্ত। কোন্ গ্রাম্য বালকেরা ঐ বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিহুতিয়েরা উহাকে বলিয়াছিল "হনুমানজীউর তিলক"। হনুমানজীউর হউক, আর যাহারই হউক, এই তথাকথিত তিলক একটা রাজনৈতিক তুফান উপস্থিত করিয়াছিল। এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানেরা উহাতে একটা অজ্ঞাত আসন্ন ও অতি বিরাট বিভ্রাট কল্পনা করিয়াছিলেন, তিলকাঙ্কে প্রকৃত প্রস্তাবেই সেই ত্রেতাযুগপ্রসিদ্ধ বীরের লঙ্কাদগ্ধকারী মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে অতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার জাতি যাহাতে জুজু দেখেন, তাহাই রাজনীতির অন্তর্গত; অন্যের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাহা রাজনীতির চক্ষে ভীষণ বিভীষিকা; সুতরাং ত্রিহুতের তিলক চালাচালি সিপাই মিউটিনীর সময়ের চাপাটী চালাচালির

অনুরূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কারণের মধ্যে এই তিলকের একটা প্রকাণ্ড কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যে, কাপড় স্থতার উপর কর না বসাতেই লোকে অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ; অচিরাৎ একটা মিউটিনী করিয়া এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে এণ্ডাবাচ্ছাসহ সটান অক্ষয় স্বর্গধামে পাঠাইবে। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আসন্ন। সেই বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ আম্রবৃক্ষে তিলকাকারে অঙ্কিত ! !

মোটের উপর অবস্থা হইয়াছিল এই। অতএব উপরোক্ত আন্দোলন অস্বাভাবিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে উত্থিত হইলেও নিষ্ফল হইবে কেন ? মাঞ্চিষ্টারের স্বার্থ ও ষ্টেট-সেক্রেটারীর সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতি আমদানি কাপড় স্থতার করের অঙ্কুর তখনি হইয়াছিল। সে অঙ্কুর এখন এক বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতি আমদানি কাপড় ও স্থতার উপর শুল্ক বসিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ও সেই অনুপাতে এ দেশীয় কলের স্থতার উপরেও কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। স্বাধীন বাণিজ্যের মূল সূত্র এবং ততোধিক, বাণিজ্যপরায়ণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লাঙ্কেসায়েরী স্বার্থ, উহা অগত্যাই করিতে বাধ্য। বিলাতি আমদানি কাপড় স্থতার উপর কর বসিলে এ দেশীয় কলের কাপড় স্থতার উপর অবশ্যই কর বসিবে, এ কথা গবর্ণমেণ্ট তখনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আন্দোলনকারীদের কতক লোকে হয় ত তাহা বুঝেন নাই ; কতক লোকে তাহা বুঝিয়া সজ্ঞানে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সে করও বহনে সম্মত হইয়াছিলেন। নহিলে পরের যাত্রা-ভঙ্গার্থে আপন নাসিকার সম্পূর্ণ ছেদনকার্য্য সম্পাদন হইবে কেন ? অতএব যাঁহারা বিলাতি আমদানি বস্ত্রের মাশুলের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, অন্ততঃ

তাঁহাদের পক্ষে এখন উক্ত কর বসিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করা কেবল অন্যায় ও অসঙ্গত নহে, উন্মাদ রোগের লক্ষণ। বিলাতি আমদানি কাপড়ের উপর কর বসিলে দেশী কাপড়েও কর লাগিবে ইহা সকলেই জানিত; গবর্ণমেণ্ট নিজে এ কথা বলিয়াছিলেন; ষ্টেট সেক্রেটারী সেই সর্ত্তে আমদানি কর মঞ্জুর করিয়াছিলেন; কাউন্সিলগৃহে স্বদেশহিতৈষী পক্ষ সে কর স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। † তবে এখন আবার কথা কেন, গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি কেন আর এত গণ্ডগোলই বা কেন? আপন নাসিকা আপনারাই কাটিয়াছ তাহাতে পরের দোষ কি? আবদার করিয়াছিলে আইন হইয়াছে আবার কি?

সাহেব সওদাগরেরা বিলাতি কাপড়ের জন্য কেন অত আন্দোলন করিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাধুতার অন্তরালে আসল অভিপ্রায় যাহা তাহা অত্যল্প পরিমাণে অনুমান করিতে পারিলেও আমরা এস্থলে বলিতে চাই না। পরন্তু স্বদেশভক্ত সম্প্রদায় সে করের জন্য কেন অত "উতলা" হইয়াছিলেন তাহাও বুঝা কঠিন। তাঁহাদের অধৈর্য্যের একটা কারণ আমরা উপরেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহা হুজুক্ "হবি" ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতি কাপড়ে মাশুল হইলে, কাপড়ের দেশী কলওয়ালাদিগের

---

† সুপ্রিম কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফাজুলভাই বিশ্রাম বলিয়াছিলেন;—I, for one, speaking as a mill owner, would be willing to support the levying of an excise duty on cotton goods manufactured in India, assuming of course that such an impost can be practically levied without injustice and serious trouble.

সুবিধা হইবে, দেশের শিল্পোন্নতি হইবে এই অনুমানেই স্বদেশ-হিতৈষীরা আমদানি করের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কার্য্যতঃ কোনও কথাই নয়। কেন না আমদানি কর হইলে "এক্সাইস" করও হইবে ইহা উভয় পক্ষে অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য মিঃ ফাজুলভাই বিসরামের ইংরাজী উক্তি আমরা ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি নিজে কাপড়ের কলের সত্বাধিকারী তথাচ বিলাতি কাপড় সূতার উপর আমদানি করের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশীয় কাপড় সূতায় শুল্ক সংস্থাপনে সম্মত হইতেছি।"

পরন্তু আমদানি করে হস্তনির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি-কল্পনা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ বিড়ম্বনাময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টী মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভবে। ক্ষুদ্র লোকের এমনি বৃহৎ কল্পনা করা সাধ্য নহে। তাঁতি রাজা মান্ধাতার আমলের আর্য্য তাঁতে বিশুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করে; সে বস্ত্র মাঞ্চিষ্টারের ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নহে; অতি উত্তম কথা। পরন্তু সেই বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূতাত্মা আর্য্যসন্তানদিগের সন্ধ্যাহ্নিক আওড়াইবার অতিরিক্ত সুবিধা হইতে পারে। ইহা আরও উত্তম। কিন্তু এই যে আর্য্য, তাঁতের বিশুদ্ধ বস্ত্র ইহাতে সূত্র কাহার? সূতা কোথা হইতে আসে সে সংবাদ কি সত্য সত্যই আপনারা কেহ রাখেন না? চিক্কন চটক্দার কালাপেড়ে পরিয়া তাহার উপর অভ্র ইস্তিরির অতি সূক্ষ্ম উড়ানী উড়াইয়া তুমি যে দেশী বস্ত্রের বাহার দেখাও সূতা কিন্তু তাহার বিলাতি। বিলাতি সূতা ব্যতীত, তোমার দেশী বস্ত্রের বাবুগিরি গলিয়া যায়; দেশী তাঁতির তাঁত শিকায় উঠে। বোম্বা-

য়ের কলে জোর ২৪ নম্বরের সূত্র অবধি জন্মে, তাহার অধিক সূক্ষ্ম সূত্র জন্মে না; কিন্তু তোমার বাবুয়ানার উপকরণ ও গৃহিণীর লজ্জানিবারণের (!) জন্য বস্ত্রটা ৮০ নম্বরেরও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত হইলে ভাল হয়; কিন্তু, সে সব সূত্র বিলাত হইতেই আসিয়া থাকে। দেশী তাঁতি বিলাতি সূত্রের দ্বারাই বস্ত্র বোনে। অতএব বিলাতি সূত্রে শুল্ক বসিয়া দেশীয় বস্ত্রের শিল্পোন্নতি কোন্ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হইবে তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। ট্যারিফ শুল্কে বিলাতি বস্ত্রের মূল্যাধিক্যের অনুপাতে দেশী বস্ত্রের মূল্যও দারুণ বৃদ্ধি হইবে; কেন না বিলাতি সূত্রে দেশী বস্ত্র নির্ম্মিত; সূত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এরূপ স্থলে লোকে বিলাতি কাপড় (তাহার মূল্য আমদানি শুল্কে এখনকার অপেক্ষা বাড়িলেও) ছাড়িয়া তদপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্যের দেশী বস্ত্র কিনিতে চাহিবে কেন? আর পেট্রিয়টিজিমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায়? পেট্রিয়টিক স্পিরিটে ত আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না। বলিবে "বোম্বাই কলের কাপড় পরিবে। বঙ্গদেশেও কাপড়ের কল হইতেছে।" বঙ্গীয় কলের বস্ত্র আজও বাহির হয় নাই; হইলেও তাহা এবং বোম্বাই কলের বস্ত্র, বিলাতি বস্ত্রের অপেক্ষা এক কাক্রিও শস্তা হইবে না; বরং এক আনা বেশীই হইবে। কারণ আকাঙ্ক্ষিত আমদানি করের অনুকম্পায় সে কাপড়ের সূতার উপরেও এক্সাইস শুল্ক বসিয়াছে। এক্সাইস শুল্ক না বসিলেও সম্ভবতঃ তাহা বিলাতি কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। পরন্তু দেশী কলে কাপড় অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মে; আর সে কাপড় এত অধিক মোটা যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা সর্ব্বদা ব্যবহারেরও যোগ্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও সংসারের

প্রতিদৈনিক সম্ভাবনাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি। উদ্ভট "অঘটন পটিয়স" পেট্রিয়টিজেমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে। সে কথায় বড় বড় বক্তৃতা ও লম্বা চওড়া প্রবন্ধ প্রস্তুতই হইতে পারে; সংসারের আর কোন কার্য্যই তদ্দ্বারা হয় না; বিশেষতঃ উদরের অন্ন ও অঙ্গের আবরণের সহিত তাহার আকাশ পাতাল অপেক্ষাও সুদূর সম্বন্ধ। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদানিকারীদের অনর্থক আবদারে বস্ত্রাদির উপর আমদানি কর বসিয়া আমাদের ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র মহার্ঘ হইল, বোম্বাই কলের কাপড়ের মূল্য বাড়িল; পরন্তু দেশী কাপড়ও অগ্নিমূল্য হইল। অতএব এই আমদানি শুল্কে দেশটা রাতারাতি উন্নতির ঊর্দ্ধমার্গে দশ যোজন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, পাপমুখে একথা কিরূপে বলিব?

বলিবে আর যত কিছু না হউক মাঞ্চেষ্টার বস্ত্রবণিকের ত অনিষ্ট হইল। তা বটে! কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেষ্টারের অনিষ্ট চেষ্টা করা পুরাতন নীতিশাস্ত্রানুসারে অন্যায়; কিন্তু ইষ্ট না থাকা সত্ত্বেও পরের অনিষ্ট করাকে কি বলিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেষ্টারের সবিশেষ অনিষ্টই বা হইবে কেন? তাহার দশযোড়া কাপড় যেখানে বিক্রয় হইত, সেখানে না হয় এখন ছয়যোড়া বিক্রয় হইবে; ইহার অধিক ত আর কিছু নয়! কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ও অবিক্রত সেই চারি যোড়া কাপড় যাহারা কিনিয়া এত দিন পরিতে পারিত, তাহারা অতঃপর যে একেবারেই কাপড় পরিতে পারিবে না; এই মাঘের শীতে "জানু ভানু কৃষানু" ব্যতীত অনন্যোপায় হইবে, সে অনিষ্ট কাহার? মাঞ্চেষ্টারের অথবা তুমি যে দেশের ভক্ত বলিয়া ভড়ং দেখাইয়া থাক, সেই দেশেরই? তৃতীয় প্রশ্ন, প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চেষ্টারের অপরাধই বা কি যে, তাহার

পশ্চাতে লাগিয়াছিলে ? স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের স্বতঃ শিরোধার্য্য, কিন্তু, তাহার অযথার্থত মহিমা কীর্ত্তন করাকে আমরা তাহার প্রকৃত মর্য্যদাটীকে মাটী করাই মনে করি। তুমি বড়ায়ের বোকামি করিয়া আর্য্যামির যতই অতিরিক্ত আস্পর্দ্ধা কর না কেন, ইহা সকলেই জানে যে, সে কালের চরকার আমলে দেশের অদরিদ্রদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে দুইখানা বস্ত্র একত্রে ব্যবহার করিতে পাইত। দরিদ্র শ্রেণীর বস্ত্র পরিধান বিলাসের কথা এখানে না বলাই ভাল। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীরাও তখন চরকা কাটিতেন। অন্যূন চারিমাস চরকা না ঘুরাইলে একখানা কাপড়ের উপযুক্ত সুতার সংস্থান হইত না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বস্ত্রের সুবিধাটী তখন কেমন ছিল। তোমার সাত গাঁটের বস্ত্র সওদাগরি ও ঢাকাই মসলিন মশলন্দের কথা শুনিবা মাত্রই আমরা মোহিত হইয়া "মরি মরি" বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু সে 'মরি মরিতে' আসল ঘটনা মারা যাইবে না। তখন সমগ্র দেশমধ্যেই বস্ত্রের অভাব বিলক্ষণই ছিল। মাঞ্চিষ্টারের অপরাধ এই যে, সে এদেশে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিয়াছিল এবং করিতেছে। সুলভ বস্ত্র আনিয়া দেশের ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণকে বস্ত্র পরাইয়াছে। সে, সূক্ষ্ম সূত্র পাঠাইয়া তোমার বাবুগিরি বজায় রাখিয়াছে; বরং বিলক্ষণ বৃদ্ধিই করিয়াছে। পরন্তু, তাহারই জন্য দেশীয় তাঁতির তাঁত আজও চলিয়াছে। মাঞ্চিষ্টারের অপরাধ এই। এই অপরাধে এত রাগ? তুমি আরও রাগিয়া বলিবে "অপরাধ অবশ্যই অপরিসীম অপরাধ। তাহারই জন্য ত এদেশীয় তাঁতিকুল উৎসন্নে গিয়াছে।" এইরূপ উক্তির ধুয়াটা কিছুকাল হইতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিয়াছে বটে; কিন্তু, প্রিয় মহাশয় আপনার এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন

স্বীকার করা যায় না তাহা বুঝাইবার স্থান এখানে নাই; কিছু সবুর করিলে বুঝাইতে পারি। কিন্তু, তাহা স্বীকার করিলেই বা কি? স্বীকারই না হয় করিলাম মাঞ্চিষ্টারের সুলভ বস্ত্রের দৌরাত্ম্যে দেশের তাঁতিদের তাঁতবোনার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে; তাহারা উৎসন্ন হইতেছে। কিন্তু মাঞ্চিষ্টারের এই অনিষ্টে, অনিষ্টই যদি ইহা হয়,—আমাদের তাঁতিরা কি উৎসন্নের পথ হইতে ফিরিতে পারিবে? আমরা উপরেই দেখাইয়াছি, মহাশয়রা অনর্থক আন্দোলনে যাহা করিলেন, তাহাতে আমাদের তাঁতিদের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই কুলই বরং গেল। তার পর কেবল এক তাঁতিকুলের সুবিধা সচ্ছলতার জন্য, সমগ্র দেশের লোক দুঃখ সহ্য করিবে, সুলভ বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে, সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? অথবা সুযুক্তির কথা? এখন সর্ব্বশেষে আর একটী প্রশ্ন আছে। এই যে আমদানি মাশুল বসিল, এ মাশুল ফলিতার্থে দিবে কে? দিবে বিক্রেতা কিম্বা ক্রেতা? ক্রেতারই ত এ মাশুল দিতে হইবে। মাঞ্চিষ্টার ত এ মাশুল দিবে না মহাশয়; দিতে হইবে যে আমাদেরই। এ কথাটা কি আপনারা একটী বারও ভাবিয়াছিলেন? হায়! ভাবিবার অবসর পান নাই; ভাবা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

অতীব অভাগ্যের বিষয় যে, আবদারকারীরা চিন্তাশীলতার অতি গুরুত্বে বস্ত্রক্রেতা বলিয়া যে একটা জীবও জগতে আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাহাদের অস্তিত্ব আদৌ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা হয় ত মনে করিয়াছিলেন এ মাশুল মাঞ্চিষ্টারই দিবে। ভারতবাসীর দিতে হইবে না। কিন্তু ষ্টেট-সেক্রেটারী আপন কর্ত্তব্য ভুলেন

নাই। তিনি যথাসময়েই স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে আমদানি কর মাঞ্চিষ্টারের স্কন্ধে পড়িবে না; প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িবে তাহা ভারতেরই স্কন্ধে। পরন্তু তাহাতে করিয়া দরিদ্র রায়তের বস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ বিভ্রাটই ঘটিবে। * কিন্তু সে কথা শুনে কে? সেক্রেটারীর সমীচীন উক্তি তৎপ্রতি পলিসি আরোপেরই কারণ হইয়াছিল। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হইলে সেক্রেটারী-অব্-ষ্টেট এ সম্বন্ধে অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। তবে তিনি সকল দিক রাখিতে গিয়া কোনও দিকই রক্ষা করিতে পারেন নাই; এ কথাও সত্য। তিনি এ দেশীয় আন্দোলকদিগের সন্তোষার্থে বিলাতি বস্ত্রের আমদানি কর এবং মাঞ্চিষ্টারের মন রাখিবার জন্য এ দেশে এক্সাইজ কর বসাইয়াছেন;—ফল হইয়াছে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ। পরন্তু বস্ত্রক্রেতা দরিদ্র প্রজা-সাধারণেরও তিনি সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। কারণ কাপড়ের কর তাহাদিগেরই দিতে হইবে।

এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের অর্থের অনটন। বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক বিষম বেশী। ব্যয়ের অঙ্কের সহিত আয়ের অঙ্ক যে রূপেই হউক সমান করিতে হইত। তজ্জন্য

* I should like to ask who is going to pay the taxes on the goods imported? The people of India, the consumers of India. * * Whether import duties are right or wrong, whatever duty you levy on cotton goods must inevitably be paid by the people who wear these cotton goods in India. The tax, would therefore be a tax upon the people of India and not upon the Lancashire manufacture. সেক্রেটরী অব ষ্টেট মিঃ ফাউলারের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

গরিব রায়তের শরীরের শিরা কাটিয়া শোণিত বাহির করিতে হইলেও গবর্ণমেণ্ট ছাড়িতেন না। অতএব ট্যারিফটেক্স হইয়া বরং ঠেকাইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই আর একটা নেহাত সাংঘাতিক শুল্ক সংস্থাপিত হইয়া দেশমধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইত।

আমরা এরূপ যুক্তি আপাদমস্তক অনুমোদন করিতে পারি না। বজেটের দুই দিকে একই অঙ্ক সন্নিবেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট গর্হিত উপায়ে আয়ের অঙ্ক না বাড়াইয়া উচিত উপায়ে ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া আয়ের অঙ্কের অনুপাতে আনিতে পারিতেন। তজ্জন্য আন্দোলন হইতেছিল। সেই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপ্ত ও বলশালী করা উচিত ছিল। নাশানাল কঙ্গ্রেস গবর্ণমেণ্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য বহুকাল আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলন একেবারেই যে নিষ্ফল হইয়াছে ও হইবে এমনও নয়! এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা কমিসনেরও আদেশ হইয়াছে। সে কমিসনের কার্য্য আরম্ভ ও শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে এই উৎকট কর বসাইবার অবসর দেওয়া ও অনুরোধ করা প্রজানীতির উচিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমদানি টেক্স বসাইয়াছিলেন। তাহারই প্রাণপণ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল; গবর্ণমেণ্ট যে দ্রব্যের উপর টেক্স বসাইতে উৎসুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক আন্দোলন দ্বারা তাহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা প্রকৃত প্রজানীতির অনুরূপ কার্য্য হয় নাই। পরন্তু, এই কাপড়ের কর আর কোনও কুৎসিত কর অপেক্ষা কিছুতেই কম কষ্টকর ও ঘৃণিত নহে। গবর্ণমেণ্ট নেহাত যথেচ্ছাচারী হইয়া আর কোনও একটা কুৎসিত কর সংস্থাপন করিলে এবং প্রজাপক্ষ হইতে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে আপত্তি হইলে, সে কর নিশ্চয়ই চিরকাল টিঁকিত

না। ফলতঃ আবদার করিয়া একটা এত বড় করভার গ্রহণ করা নেহাত নির্ব্বোধের কাজ--নিজের নাসিকা ছেদনের মতই হইয়াছে। কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষই হউক কর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরোক্ষ হওয়াতে করের প্রচণ্ডতা কিছুই কমে না ; তাহাতে করিয়া কেবল তাহার কপটতা ও প্রবঞ্চনাই সূচিত হয়।

এ দেশে ইংরাজের আমলে বস্ত্রকর বহুকালই ছিল না। খৃঃ ১৮৫৯ সালে এই কর প্রবর্ত্তিত হয়। আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শত করা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসে। এবং সেই হিসাবে ঐ শুল্ক পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। ১৮৬৪ সালের ২৩ আইনে উহা পাঁচ টাকা হইতে শত করা সাড়ে সাত টাকায় উঠে।১০।১১ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালের ১৬ আইনে উহা পুনঃ পাঁচ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে এই শুল্ক একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালের ১১ আইনে ট্যারিফ টেক্স সম্পূর্ণ রূপে রহিত হইয়াছিল এবং অনেকানেক রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলও উঠিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার বার বৎসর পরে পুনঃ বস্ত্রকর আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র যখন নিষ্কর ছিল তখনি সব লোকে বস্ত্রের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। দেশ এতই দরিদ্র যে মাঞ্চিষ্টারের মহা সুলভ বস্ত্রও সকলে কিনিতে পারে নাই। এই প্রবন্ধের লেখক দেশমধ্যে এমন অনেক পল্লী ও পরগণা দেখিয়াছে যেখানে বার আনা রকম লোক নির্বস্ত্র। কৃষাণ ও মজুর শ্রেণীর পরিধেয় কেবল অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী লঙ্গটী মাত্র। "শতগ্রন্থি বস্ত্র" প্রবাদবাক্য ; কিন্তু সহস্রাধিক গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে ললনা-অঙ্গের লজ্জা আবৃত বা অনাবৃত হইতেও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। বস্ত্রের নিষ্কর সময়েও অনেকস্থলে অবস্থা এই ; অতএব বস্ত্রের উপর কর বসিয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিৎমাত্র বাড়িলেও ঐ অবস্থা কিরূপ হইবে

তাহা কেবল অনুভবনীয়। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটী দ্রব্য মনুষ্য জীবনে এবং মনুষ্যসমাজে একান্ত অপরিহার্য্য আবশ্যকীয়; এই দুই সামগ্রী যত সুলভ ও সুপ্রাপ্য হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা করা রাজ-নীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই কর্ত্তব্য। মনুষ্য-অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রধান উপাদান অন্ন বস্ত্রের উপর কোনও কর বসাই উচিত নয়; বিশেষতঃ উহা অতিরিক্ত করের বিষয়ীভূত হওয়া ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অন্যায়; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।

এবারকার আইনটী যেরূপ হইল অল্পের মধ্যেই বলা যাই-তেছে। বিদেশী ও বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার শতকরা পাঁচ টাকা কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা সাবেক সি কাসটাম টেরিফ আইনেরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র একটী আইন হইয়াছে, তাহার নাম ১৮৯৪ সালের "কটন ডিউটিস্ এক্ট"। এই আইন আমদানি বস্ত্র শুল্ক আইনেরই অনিবার্য্য ফল, অগ্রেই বলিয়াছি। কেননা বিদেশী বা বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট, স্বাধীন বাণিজ্যের সূত্রানুসারে, এ দেশীয় কল-শিল্প-জাত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয় সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। সুত-রাং এ দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর বসাইতে বাধ্য। সেই কর বসাইবার জন্যই এই "কটন ডিউটিস্ এক্ট।" বিলাতি বস্ত্রে শুল্ক না বসিলে এ এক্ট বা আইন নিশ্চয়ই হইত না। এই আইন অনুসারে দেশী কলের সুতার উপর কর বসিল। সুতার শুল্কের অর্থই বস্ত্রের কর; কারণ যে সুতায় বস্ত্রে বয়ন হইবে সে সুতারও শুল্ক লাগিবে; সুতরাং বোনা বস্ত্রের উপর কর না বসিয়া অবোনা সুতার উপরেই শুল্ক হইয়াছে। অর্থ একই। করের হার আম-দানি করেরই সমান অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াই হইয়াছে।

তবে ইহার মধ্যে একটু কথা এই যে, দেশী কলে হয় মোটা সূতা; বিলাতি কলে জন্মে সরু সূতা। বোম্বে অঞ্চলের কল, বিলাতি কলের সরু সূতার সহিত বড় বেশী প্রতিযোগিতা করে না। যে পরিমাণে প্রতিযোগিতা সেই পরিমাণেই কর বা আইন প্রয়োজন। অতএব দেশী কলে যে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ও অত্যল্প সরু সূতা উৎপন্ন হয়; তাহারই উপর কর বসিয়াছে। অর্থাৎ দেশী কলে ২০ নম্বরের সূতার ও তন্নিম্ন শ্রেণীর সূতার কর লাগিবে না; ২১ নম্বর হইতে তদূর্দ্ধ নম্বরের সরু সূতারই শুল্ক লাগিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কখনও ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইহার পর অতিরিক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিপন্ন হয় যে এ দেশীয় কলে ২০ নম্বরের সূতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় না; তাহা হইলে আইন একটু সংশোধিত করিবেন; ২ নং ২৪ নম্বরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ২৪ নম্বর পর্য্যন্ত সূতার শুল্ক লাগিবে না, তদূর্দ্ধ হইলেই তাহা লাগিবে। পরন্তু, এ দেশীয় কল হইতে যে সকল সূতা অন্য দেশে রপ্তানি হইবে, তাহার শুল্ক লাগিবে না; দেশমধ্যে যে সকল সূতা বিক্রয় হইবে এবং দেশমধ্যে বিক্রেয় বস্ত্র যে সকল সূতায় প্রস্তুত হইবে তাহারই কেবল শুল্ক লাগিবে। দেশের লোকের সুখ সুবিধার প্রতি ইহা যৎপরোনাস্তি শুভ দৃষ্টি বটে!! কটন ডিউটিস্ এক্ট সমগ্র বৃটিশ ভারতে সমান বর্ত্তিবে এবং আইন হওয়ার পর হইতেই, আজ কয়েক দিন হইল উহা আমলে আসিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যও বাদ পড়ে নাই। তাহা বিদেশ ও বিলাতের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কল হইতে যে সকল কাপড় সূতা বৃটিশ ভারতে আসিবে তাহারও শুল্ক চাই। অতএব দেশীয় রাজার রাজ্যে গিয়াও যে কাপড় সূতার কল পাতিয়া আইনের হস্ত এড়াইবে, সে উপায়ও নাই। মাননীয় মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের

এ সম্বন্ধে আমাদের উপকারে উক্তি অতি চমৎকার উপাদেয়। তাহাতে হাস্য করুণ এই উভয়বিধ বিরোধী রসেরই একত্রে উদ্রেক হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে এই আইনের অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছিল। এবং তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে অর্থ-নৈতিক কথাও নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা সমালোচনা করার স্থান নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের পক্ষ হইতে বেসরকারী সদস্যেরা যে সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত দুর্ব্বল যে তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য্য নহি।

কটন ডিউটী আইনে অন্যান্য অনিষ্ট ব্যতীত স্বদেশীয় শিল্প ও শ্রমের বিপুল অনিষ্ট সাধন করিবে। এ আইন যতই সাবধানে অনুষ্ঠিত হউক এখন হইতে এ দেশীয় কাপড় সূতার কলগুলিকে সরকারী পাহারার প্রচণ্ড দৃষ্টির উপর সর্ব্বদাই থাকিতে হইবে। বিন্দুমাত্রও পদস্খলন হইলে নিস্তার থাকিবে না। কলের কার্য্য ও সমস্ত কাগজপত্র যদৃচ্ছা সরকারী পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধীন হইবে। হিসাবের একটুকুও এদিক-ওদিক হইলে দ্রব্যের দেয় মাশুলের তিনগুণ মাশুল আদায় হইবে। সরকারি তফিখাতে কোনও রকমের তঞ্চক প্রবঞ্চনাদি প্রমাণ হইলে হাজারও টাকা জরিমানা হইবে; পেনালকোড আমলে আসিবে; কলওয়ালা-দিগের কারাবাসও হইতে পারিবে। কলের কাপড় সূতার স্বদেশীয় শিল্প তাহার এই শৈশবাবস্থায় আইনের এত অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কলের সত্বাধিকারীরা স্বভাবতই মহা উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। আইনে আপত্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন আপত্তি করা অনর্থক।

"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। আক্ষেপ এই যে, স্বদেশহিতৈষীরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার অবসর দেন নাই। আবদার করিয়াই এই উৎকট আইন করাইয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে ;—

The finer classes of cotton manufactured in India enter into direct competition with the cotton manufactures imported from England. As it is intended to weight these last with an inport duty, it is considered necessary to levy at the sametime a countervailing duty upon the competitive classes of Indian manufactures.

অতএব আপত্তি করা এখন বৃথা। এই আইন হওয়ার অঙ্গীকারেই আমদানি কর বসিয়াছে। আমদানি কর না উঠিয়া গেলে, এ আইন রদেরও সম্ভাবনা নাই! আমরা এ উভয়কেই সমান আপদজনক বিবেচনা করি। বেঙ্গল কাউন্সিলে ড্রেণেজ কর প্রস্তুত হইয়াছে ; অবিলম্বেই আবির্ভূত হইয়া জমিদার ও রায়তের কর-ভারপীড়িত স্কন্ধ পুনঃ প্রপীড়িত কবিবে। তাহার পূর্ব্বেই কাপড়ের কর উপস্থিত। দেশে অন্নবস্ত্রের একেই ত এই সচ্ছলতা তাহার উপর আইন কানুনের এমন সব মেওয়া ফল, পরম রমণীয়ই বটে! তবে আমাদের শত্রুশিবির হইতে বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল আগমনের আশা করা যাইতে পারে। আমদানি মাশুলে মাঞ্চিষ্টারের মহাজন ও শক্তিশালী শ্রমজীবীগণ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এ আপত্তি উগ্রভাব ধারণ করিলে, তাহা উল্লংঘন করা বড় সহজসাধ্য হইবে না ; একটা সুযোগ খুঁজিয়া আমদানি কর উঠাইতেই হইবে। যদি আদৌ কোনও আশা থাকে, ইহাই এখন আশা।

পৌষ সংক্রান্তি।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে যেন প্রভাত হোমানল জ্বলিয়া উঠিল এবং বৃহৎ প্রান্তরের শিশিরসিঞ্চিত শ্যামল তৃণদল, আইরি বন, গোধূমের দীর্ঘ শীর্ষ আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া আইল ঘুরিয়া আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম। তখনও পথে লোক চলিতে আরম্ভ হয় নাই, কেবল খেজুর গাছ হইতে দুই একজন গাছি খর্জ্জুর রস সঞ্চয় করিয়া বাঁকের দুইদিকে আট দশটা ছোট কলসী ঝুলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অদূরবর্ত্তী গমের জমীতে একটা বৃষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরম সুখে গোধূম শীর্ষ চর্ব্বণ করিতেছে, পৌষের প্রচণ্ড শীত তাহার বিশাল দেহকে কাতর করিতে পারে নাই, ক্ষেত্র স্বামীর উদ্যত দণ্ডকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

আরও অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করিলাম, ক্রমে দুই একটি মনুষ্য দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল, দুইটি রাখাল গায়ে কাঁথা জড়াইয়া গোরু ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে গোচারণের মাঠে প্রবেশ করিল—সঙ্গে দুইটি নবজাত বৎস ছিল, মুক্ত প্রান্তরে এই প্রভাতের সূর্য্যালোকে তাহারা আনন্দে ছুটিতে লাগিল এবং তাহারা বহুদূরবর্ত্তী হইলে তাহাদের স্নেহবৎসল মাতা চলিতে চলিতে এক একবার উন্নত মস্তকে স্থির দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল।

আইলের একদিকে শর্ষপ অন্য দিকে ছোলার ক্ষেত; প্রাতঃ-সূর্য্যের স্বর্ণময় আভায় শর্ষপের পীতবর্ণ ফুলগুলিতে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। একটি স্ত্রীলোক শরিষা ক্ষেতের মধ্যে হইতে বাছিয়া বাছিয়া "তারামণি" ফুল তুলিয়া ঝুড়িতে ফেলিতেছে। ফুলগুলি শর্ষপ ফুল অপেক্ষা কিছু বড়, বর্ণ ঈষৎ পাতলা এবং কৃষ্ণরেখাঙ্কিত,

ইহা সুস্বাদু ব্যঞ্জনরূপে পল্লীবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পাশে ছোলার জমীতে ছোলার ছোট ছোট ঘনশ্যাম ঝোপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল এবং সাদা ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, সেথানেও একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছোলার কচি কচি ডগা ভাঙ্গিতেছে। এই ফুল ও শাক তুলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিবে। পয়সার পরিবর্ত্তে তাহারা চাউল গ্রহণ করিতেই ভালবাসে, কারণ জানে পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীগণ চাউল অপেক্ষা পয়সাকে অধিক আদর করেন সুতরাং আধপাথি চাউলের মূল্য এক পয়সা অপেক্ষা কম না হইলেও তাহা লইয়া তাহারা যে ফুল বা শাক দেয় তাহার মূল্য অর্দ্ধ পয়সা অপেক্ষাও কম; সরলহৃদয় গৃহলক্ষ্মীগণ সন্তুষ্ট মনে তাহাই গ্রহণ করেন। এই সকল শাকবিক্রয়িত্রীর দিন ইহা-তেই বেশ সুখে চলিয়া যায়, ইহার উপর কাহারো ছেলেটি হয়ত রাখাল, সে সারামাস গৃহস্থের গরু চরাইয়া তাহার মনিবের নিকট যাহা পায় তাহাই তাহার মাসিক ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট, কেহ কেহ গৃহপ্রাঙ্গণে তরি তরকারী লাগায়, তাহা বিক্রয় করে, ঘরের খোরাকও চলে, এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট মেয়েরা ডোবা ও বিল হইতে কাপড় কিম্বা ছোট ছোট জাল ছাঁকা দিয়া চিংড়ি চ্যাং সোলমাছের পোনা প্রভৃতি মাছ ধরিয়া আনে, এই সকল কারণে অতি দুর্ব্বৎসরেও পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোক অনাহারে মরে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে একটা পতিত জমীর উপর আসিয়া পড়িলাম, অনেক দিনের পতিত জমী লাঙ্গলের সাধ্য নাই, তাহাতে দন্তস্ফুট করে। আট দশ জন মজুর "দেঁড়ো" কোদালী লইয়া সেই জমী কোপাইতেছে; আট দশখানি কোদালী এক সঙ্গে উঠিতেছে, শাণিতধার সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, আবার এক সঙ্গে

সেই অনুর্ব্বর কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া বড় বড় চাপ উঠাইয়া ফেলিতেছে।

বেলা আটটার সময় "কাজলার খালের" কাছে আসিলাম। কাজলার খাল হইতে বাসুদেবপুর এক ক্রোশেরও কিছু কম, এখানে আসিয়া আবার গতিরোধ হইল, খালের যে অংশ দিয়া লোকে গতিবিধি করে সেখানে এক হাঁটু জল, আমার পায়ে জুতা এবং মোজা, আমরা নগরবাসী, নগ্নপদে এই জল ও কর্দ্দম অতিক্রম করার বিড়ম্বনা বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণের প্রলোভন অপেক্ষা অনেক অধিক—বিশেষ যদি শীত কাল না হইত! কিং-কর্ত্তব্য ভাবিতেছি, এমন সময় একজন পথিক জানাইল যদি আমি আইল ধরিয়া আরও আধ ক্রোশ দক্ষিণে যাই তাহা হইলে পুলের উপর উঠিয়া দিব্য "খরা শুকনো" ভাবে যাইতে পারিব, জুতা এবং মোজার জন্য দুর্ভাবনা থাকিবে না।

তাহাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আবার আইল ধরিয়া সেই পুলের উদ্দেশে চলিলাম, আমার বামভাগে খাল; কিন্তু ক্রমেই খালের জল গভীর বোধ হইতে লাগিল, একস্থানে দেখিলাম পদ্মবন, পদ্মপত্রে সেই গভীর স্থির নির্ম্মল জল ঢাকিয়া আছে, প্রচুর ফুল ফুটিয়া ঢল ঢল কান্তি বিকাশ করিতেছে, দুই তীরে শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্র, দশমিনিটের মধ্যে পুলের উপর উঠিলাম।

পুলটি বড় নহে; তিন চারিটি তালগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দুই তীরের উপর ফেলিয়া তাহাতে মাটী চাপা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া লোকে জিনিষপত্র মাথায় করিয়া বাসুদেবপুরে হাট করিতে যায়। বাসুদেবপুরের নীল কুটীর ম্যানেজার ডন্ সাহেব এবং তাঁহার দেওয়ান জনার্দ্দন বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া এই পুলের উপর দিয়া নীলের জমী তদারক

করিতে যান। বাসুদেব পুরের কুটীর সাহেবরাই এই পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইহার দুই দিকের বিস্তার অনেক খানি, খানিকটা যায়গা বেশ পরিষ্কার, নিচে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দুই একটা চাঁদা বা কাঁকাল মাছ সেই অগভীর নির্ম্মল জলের মধ্যে কখন ভাসিতেছে, কখন লঘুডানা অতিবেগে সঞ্চালিত করিয়া শৈবাল দলে লুকাইতেছে, আবার বাহির হইয়া আসিতেছে। বোধ হইল এই স্থানে পল্লীবাসীগণ স্নান করে। উত্তর তীরে সবুজ গালিচার মত শুশুনির শাক।

একটু দূরে দেখিলাম হেলাঞ্চা ও কল্মি বন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, কল্মির ঈষৎ শ্বেত ও বায়লেট রঙ্গের শত শত ফুল ফুটিয়া আছে, এবং তাহার উপর এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী পুচ্ছ নাচাইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে—ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল ছোট ছোট মেয়েরা সেকালে পুকুর পূজা করিবার সময় বলিত :—

"হেলঞ্চ কল্মি লক্ লক্ করে
তার উপরে পক্ষী চরে
রাজার বেটা পক্ষী মারে।"

হেলঞ্চ কল্মি লক্ লক্ করিতেছে, তাহার উপরে পক্ষীও চরিতেছে বটে কিন্তু দেখিলাম রাজার বেটার পরিবর্ত্তে দুটো বাগ্দির বেটা অদূরে বসিয়া ছিপদিয়া মাছ মারিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া কস্মিন কালেও রাজার বেটা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নহে।

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ একটি মাঠ, তাহার অপর প্রান্তে বৃহৎ তেঁতুল গাছ, সেই গাছ অতিক্রম করিলেই বাসুদেবপুর। খর্জ্জুর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম ছেলের দল রসের জন্য খেজুর গাছে ছোট ছোট ভাঁড় ও বাঁসের চোঙা বাঁধিয়া যাইতেছে, ফিঙ্গে শালিক এবং বুলবুল্ প্রভৃতি পক্ষী দলে দলে খেজুর গাছে বসিতেছে, চারিদিকে উড়িতেছে, রস পান করিতেছে।

তেঁতুল গাছের নিকট গুড়ের বাইন। খেজুরের পাতা একত্র বাঁধিয়া খানিকটা যায়গা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে রস জ্বাল দেওয়ার বৃহৎ উনন, রাজ্যের ভাঁট ও কালকাসিন্দে প্রভৃতি গুল্ম কাটিয়া সেখানে জমা করা হইয়াছে এবং সেই শুষ্ক গুল্ম জ্বালাইয়া রসে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হইতেছে। দশ পনেরটি ছোট ছোট ছেলে পাতার ঠোঙ্গা লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে, গুড় জ্বাল হইলে তাহারা প্রত্যেক ঠোঙ্গায় একটু একটু ভাগ লইয়া থাকে, এবং সানন্দ চিত্তে তাহার আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক চরিতার্থ হয়।

বেলা নটার সময় নিমন্ত্রণ গৃহে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুর সঙ্গে তাঁহাদের বাগানে চলিলাম, সেখান হইতে ইঁচোড় সংগ্রহ করিয়া আনা হইল, সজিনার ফুল ভাঙ্গানো হইল, তাঁহাদের চালে লাউ শিম, আঙ্গিনায় বেগুণ ছিল তাহাও উত্তোলিত হইল; এতদ্ভিন্ন পালঙের শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতির বন্দোবস্তও বাদ গেল না। আর চিনি কিম্বা নূতন খেজুর গুড়ের পরিবর্ত্তে খেজুরের রসের পায়েস। আহারের সময় আনন্দমঠে দুর্ভিক্ষের বৎসর ভগিনীগৃহে জীবানন্দ গোস্বামীর আহারের ঘটা মনে পড়িয়া গেল।

আহারাদি শেষ হইতে না হইতে একদল চাষার ছেলে খুব আয়োজন করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিল, ইহাদের এ ভিক্ষা "স্পেসাল"—ইহাকে ভিক্ষা নামে অভিহিত করা যায় না, ইহা একটা অধিকার—এই ভিক্ষা লইয়া আজ ইহারা সকলে মিলিয়া প্রফুল্ল

মনে 'পোষলা' করিবে। পৌষের শেষ দিন এই ভিক্ষা গ্রহণের নিয়ম। ইহারা সমস্বরে ছড়া বলিয়া ভিক্ষা করে,

"যে দেবে ডালা ডালা
তার হবে সাত গোলা,
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা,
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটী,
যে দেবে মুটো মুঠো
তার হবে হাত ঠুঁটো।"

অতি কঠিন অভিশাপের ভয় থাকিলেও চন্দোরী ঝি তাহাদিগের ধামিতে তিন চারি মুষ্টি চাউল দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে দাতা এবং গৃহীতা কাহারো আনন্দের অসদ্ভাব হইল না। এই দল চলিয়া গেলে আর একদল মুসলমান মানিকপীরের গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বমত ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

দুই প্রহরের সময় দ্বিতলের একটি কক্ষে শুইয়া নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় শ্যামার শিষ শুনিয়া আমি পূর্ব্বদিকের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করিলাম; সে দিকে বাঁসবন, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে এবং সূর্য্যের দুই একটি কিরণধারা ঘন বংশপত্রের মধ্য দিয়া নিম্নবর্ত্তী ভাঁট বনের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ঝোপের ভিতর বসিয়া শ্যামা শিষ দিতেছে এবং নিকটবর্ত্তী নিবিড়পত্র কামরাঙ্গা গাছের শাখায় বসিয়া একটা ঘুঘু অতি করুণস্বরে তাহার মর্ম্মবেদনা সেই আলস্যমন্থরগতি উদাস মধ্যাহ্নের স্তব্ধ বক্ষে ঢালিয়া দিতেছে।

বাঁস ঝাড়ের নিকটে একটি দিঘি। প্রায় চারিদিকেই বেতবন,

পূর্ব্বদিকে একটা মেঠোরাস্তা—এবং সেই দিকেই কিছু পরিস্কার, মাঠের গোরু সে দিকে নামিয়া জলপান করে এবং পাড়ার মেয়েরা কলসী করিয়া বিকালে সে দিক হইতে জল লইয়া যায়।

বৈকালে আমি একবার খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাঁসবনের নীচে দিয়া বেতের ঝোপের পাশদিয়া—দিঘির ধারে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে একটি মধুর দৃশ্য উন্মুক্ত হইল। বেলা পড়িয়াছে। দীর্ঘিকার অপর প্রান্তস্থ একটা বটগাছের দীর্ঘছায়া দীঘির জলে আসিয়া পড়িয়াছে, দূরে দূরে গোরু চরিয়া বেড়াইতেছে এবং তীরে রাখালের দল 'পোষলা' সারিয়া "ডাণ্ডা গুলি" খেলিতেছে। দুই একটি পল্লী-বালিকা আসিয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া গেল, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহভার অপেক্ষা জলপূর্ণ কলসীগুলি অধিক ভারী। কিন্তু তাহাই তাহারা কেমন শান্তভাবে কক্ষে তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যাকালে পল্লীবাসিনীগণ গৃহপ্রাঙ্গণ সাদা আলিপানায় চিত্রিত করিতে লাগিল এবং ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সকল পাড়াতেই আজ আনন্দোৎসব। গৃহে গৃহে গৃহিনীগণ পিঠে, পুলি, আঁদশা ভাজিতেছেন, যে যাহার আত্মীয়, যে যাহার প্রিয় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

রাত্রে সমারোহপূর্ব্বক বন্ধুগৃহে আহারাদি সম্পন্ন হইল। বাল্য-কালে যে সকল মিষ্টান্ন অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইত, এবং এদানী যাহার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিষিদ্ধ মাংসের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, শৈশবের সেই সকল রুচিকর খাদ্য আজিকার এই আতিথ্য সৎকারের মধ্যে প্রীতিকর হইয়া উঠিল।

রাত্রিশেষে কলরবের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইল। গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া একবার ছাদের উপর আসিলাম। পাড়ার যুবতী ও বালিকাগণ দীপহস্তে গৃহাঙ্গনে ইতস্তত বেড়াইতেছে এবং সমস্বরে কি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বন্ধুগৃহেও সে শব্দ শুনিতে পাইলাম—আলোক হস্তে বিনয়কুমারের কন্যা ও ছোট ভগ্নিটি আলপনার উপর চাউল গুড়া ও একটি করিয়া দূর্ব্বামণ্ডিত, সিন্দূর-রঞ্জিত গোবরের নুড়ি রাখিয়া যাইতেছে এবং বলিতেছে—

পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেও না
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেও না
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেও না
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না।"

কিন্তু তথাপি পৌষ গেল, পল্লাবাসিনীদিগের সমবেত আকুল আহ্বান তাহাকে রাখিতে পারিল না। অতি প্রত্যুষে আমি বন্ধুগৃহ হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। পূর্ব্বদিক ফরসা হইলেও আকাশে তখন দুই একটি তারা ছিল এবং পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষের ম্লান চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছিল, পশ্চাতে বাঁসবন নিস্তব্ধ, নিদ্রা-মগ্ন—অস্তোন্মুখ চন্দ্রের ক্ষীণ কিরণে বাঁসবনের ও দীর্ঘ নিমগাছের সুস্ত ছায়া সেই পুরাতন অট্টালিকা ও গৃহপ্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেই চন্দ্রকরে আলিপানাগুলি বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং তাহার উপর গোবরের নুড়িগুলিও সুন্দর দেখাইতেছে।

কৃষ্ণচরিত্র।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনে একটা সচেষ্টতা এবং স্বাধীনতার উদ্যম দেখা দিয়াছে। সেই উদ্যমটি একবার জাগ্রত হইয়া উঠিলে তাহাকে কোন একটিমাত্র বিষয়ে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; দাবানল একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর গণ্ডী মানিয়া চলে না। আমাদের এই নূতন জীবন-চাঞ্চল্য, সমাজ-তন্ত্র, সম্রাজ্যতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র, সর্ব্বত্রই আঘাত বিস্তার করিতেছে। ইংরাজ মনে মনে বলিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার এই নূতন উদ্যম কেবল যদি সমাজে এবং ধর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হয় তাহা হইলেই ভাল হয়, রাজ্যতন্ত্রে তাহার সচেষ্ট দৃষ্টি না পড়াই উচিত; আমরা যাহা করিতেছি তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আমা-দিগকে মা বাপ জ্ঞান করিয়া সে সন্তুষ্ট থাক্; কিন্তু চিরপ্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ বিচারের ছুরি চালনা করা তাহার কর্ত্তব্য। আবার আমাদের এক শ্রেণীর পেট্রিয়ট আছেন তাঁহারা স্বাধীন বিচারশক্তি কেবল রাজ্যতন্ত্রেই প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন—এবং সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধভাবে চির-প্রথার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন একটা প্রবল শক্তির উদ্বোধন হইলে সে কোন এক পক্ষের সঙ্কীর্ণ সুবিধা মানিয়া চলে না; যে কোন উপলক্ষ্যে আমাদের মনের উদ্যম একবার সজাগ হইয়া উঠিলে তাহার আঘাতবেগ নানা বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে।

এই কারণে, প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজ-নীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্ম্ম-নীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।

তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।

বিচারের পর কাজের পালা। মতের দ্বারা ভাল মন্দ স্থির করা কঠিন নহে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তদনুসারে আপন কর্ত্তব্য নিয়মিত করা অত্যন্ত দুরূহ। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অতি যৎসামান্য, কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই; এই জন্য পোলিটিকাল সমালোচনা এখনো অত্যন্ত তীব্র ও প্রবলভাবে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোন কারণ ঘটে নাই; কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হাতে; অতএব ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সে জন্য আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষী করা যায় না। মানুষ বেশিক্ষণ আপনাকে দোষী করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, এবং নিজের প্রতি দোষারোপ করিয়া অম্লান বদনে বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এই জন্য সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি কৈফিয়ৎ বাহির করিয়া আমরা মনকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলাম; অবশেষে এমন হইল, যে, আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইহা আমরা কিছু অধিক উচ্চস্বরে এবং প্রাণপণ বল-সহকারে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এরূপ ব্যবহার যে কপট ও কৃত্রিম আমি তাহা বলি না। বস্তুতঃ, সমাজ ও ধর্ম্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট, যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক্ হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে

পুনরায় নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত স্পর্দ্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে;—বুক ফুলাইয়া সর্ব্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে ইহা আমাদের হার নহে, জিৎ।

আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টা রথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র রচিত হয়। যখন বড় ছোট অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল;—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের অনুমোদন নাই, সর্ব্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।

যে সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছে সেই সময়ের গতি এবং বঙ্কিমের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী অনুবর্ত্তীগণের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া দেখিলে এই কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়।

সেই বলটি আমাদের একটি স্থায়ী লাভ। সেই বলটি বাঙ্গালীর পরম আবশ্যক। সেই বল স্থানে স্থানে ন্যায় এবং শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে তথাপি তাহা আমাদের ন্যায় হীনবীর্য্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।

ভগবদ্গীতায় ফললাভকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্যের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থেও কি প্রমাণ হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহাকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যে মূল মন্ত্রে এই গ্রন্থখানি প্রাণশক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয়ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীর-

দর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়ন পূর্ব্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমতঃ তিনি বুঝাইয়াছেন জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা প্রমাণের বিষয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস সমালোচনা এই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে কেহ ইহার সূত্রপাত করিয়া যায় নাই এই জন্য ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার ভার উভয়ই বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছে। কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙ্গিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন—গড়িবার কাজে ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

মহাভারতকেই বঙ্কিম প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে মহাভারতের মধ্যে বিস্তর

প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। অথচ ঠিক কোন্‌টুকু যে মূল মহাভারত তাহা তিনি স্থাপনা করিয়া যান নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। ইহা বৈশম্পায়ন সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন সংহিতা পাইয়াছি কি না তাহা সন্দেহ। তার পরে প্রমাণ করিয়াছি, যে, ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত।"

বঙ্কিম মহাভারতে তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহুকালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছামত রচনা।

এ কথা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচিভেদে কবিত্ব ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। আবার, একই কবির রচনার একাংশ অপরাংশের সহিত কবিত্ব হিসাবে আকাশ পাতাল তফাৎ হয় এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে। মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্ব্বাচন করা প্রভৃত শ্রমসাধ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাল কবির রচনায় ভাল কাব্য থাকিতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিকতা কবিত্বের উপর নির্ভর করে না। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবিবরণসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে নানা স্থানের নানা লোকের মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। কোন উৎকৃষ্ট কবি সেই সকল গল্পের মধ্য হইতে তাঁহার কবিত্বের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া লইয়া একটি সুসঙ্গত সুন্দর কাব্য রচনা

করিয়া থাকিতে পারেন এবং অনেক অকবি ও কুকবিবর্গ তাঁহার সেই কাব্যের মধ্যে তাঁহাদের নিজের জানা ইতিহাস জুড়িয়া দিতে পারেন। সে স্থলে সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, কাব্যহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন ঐতিহাসিক নাটকে যদি পরবর্ত্তী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ রচনা নির্ব্বিচারে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে থাকেন তবে তাহাতে কাব্যের কত ত্রুটি, মূলের সহিত কত অসামঞ্জস্য এবং শেক্‌স্‌পীয়ারবর্ণিত চরিত্রের সহিত কত বিরোধ ঘটিতে থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; সে স্থলে কাব্যসমালোচক কবিত্ব বিচার করিয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল নাটক উদ্ধার করিতে পারেন কিন্তু ইতিহাস-সমালোচক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য এক মাত্র শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করিবেন এমন কথা বলিতে পারি না।

যাহা হউক; মহাভারতে, যে, নানা কালের নানা লোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের রচনা কাল ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ণয় যে কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কেবল, বঙ্কিম বাবু অনৈতিহাসিকতার একটি যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না; তাহা অনৈসর্গিকতা। প্রথমতঃ, যাহা অনৈসর্গিক তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের যে অংশে অনৈসর্গিকতা দেখা যায়, সে অংশ যে, ঘটনাকালের বহু পরে রচিত তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার আর একটি যে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যে অংশে কোন ঐতিহাসিক মহৎ ব্যক্তি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন সে অংশও যে পরবর্ত্তী কালের যোজনা তাহা সুনিশ্চিত।

অতএব বঙ্কিম যে সকল স্থলে কৃষ্ণচরিত্র হইতে অতিপ্রাকৃত অমানুষিক অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন সে স্থলে কোন ঐতিহাসিকের মনে বিরুদ্ধ তর্ক উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি, মহাভারতের একাংশের সহিত অসঙ্গত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন সেখানে পাঠকের মন নিঃসংশয় হইতে পারে না। কারণ, একটা বড় লোক এবং বড় ঘটনা সম্বন্ধে দেশে বিচিত্র জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে। সেই সকল জনশ্রুতি বর্জ্জন এবং মার্জ্জনপূর্ব্বক ভিন্ন কবি আপন আদর্শঅনুযায়ী ভিন্নরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন। (কেহবা শ্রীকৃষ্ণকে পরম ধর্ম্মশীল দেবপ্রকৃতির মানুষ বলিয়া গড়িতে পারেন, কেহবা তাঁহাকে কূটবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ চক্রীরূপে চিত্রিত করিতে পারেন। সম্ভবতঃ উভয়েরই চিত্র অসম্পূর্ণ। এবং পরস্পরবিরোধী হইলেও সম্ভবতঃ উভয়ের রচনাতেই আংশিক সত্য আছে। বস্তুতঃ নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন ইতিহাস হিসাবে কে বেশি নির্ভরযোগ্য।)

এই হেতু, বঙ্কিম, মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তি এবং মত যতটা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যে ঐতিহাসিক চরিত্র গঠন করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যথেষ্ট তথ্যমূলক নহে। বঙ্কিমবাবুও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন, যে, মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে সবই যে কৃষ্ণ বাস্তবিক বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তদ্দারা, কৃষ্ণসম্বন্ধে কবির কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু

কবির আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে ঐতিহাসিক আদর্শের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কবির কাব্য ব্যতীত অন্যান্য অনুকূল প্রমাণের আবশ্যক। আমরা একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি।— বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন,—

"কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পাণ্ডবগণ নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ হর্ষ ক্ষুধা পিপাসা হিম রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান'।"—

বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের চরিত্রনির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় এমন আমরা বিশ্বাস করি না। ইহাতে মহাভারতকার কবির মানব চরিত্রজ্ঞতা এবং হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করে। উদ্যোগপর্ব্বের নবতিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণের এই উক্তি বর্ণিত আছে; ইহার প্রায় চল্লিশ অধ্যায় পরেই কুন্তীর মুখে বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ নামক একটি পুরাতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহাতে তেজস্বিনী

বিদুলা তাঁহার যুদ্ধচেষ্টাবিমুখ পুত্র সঞ্জয়কে ক্ষত্রধর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন কৃষ্ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিদুলা বলিতেছেন— "এখনো পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না।" "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে।" "চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" "ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন; অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্পবস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।" "যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয় তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।"

ইহা হইতে এই দেখা যাইতেছে যে, কর্ত্তব্যপরায়ণতাসম্বন্ধে মহাভারতের কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল, এবং সেই আদর্শ তিনি নানা উদাহরণের দ্বারা নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন। মহাভারত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন কল্পনা করাও অসঙ্গত হয় না, যে, এক সময়ে ভারতে কর্ম্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার উদ্দেশে কবি লোকবিখ্যাত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত মহাকাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, ভীম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রধান নায়কগুলিমাত্রেই কর্ম্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল; এমন কি, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার

মহিমায় দীপ্তিমতী। সেই জন্য গান্ধারী দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন "অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

অতএব বঙ্কিম যাহা বলিতেছেন তাহাতে যদি প্রমাণের কোন ত্রুটি না থাকে তবে তদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইয়াছে, যে, কোন একটি অজ্ঞাতনামা কবির মনে মহত্ত্বের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল; এবং তাঁহার সেই উচ্চতম আদর্শ সৃষ্টিই মহাভারতের কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ যে সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রতিরূপ তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহাও দেখা যাইতেছে, যে, এই মহাভারতেই ভিন্ন লোক ভিন্ন আদর্শের কৃষ্ণ সংগঠন করিয়াছেন।

যেখানে এক সাক্ষী বিরোধী কথা কহিতেছে সেখানে অন্যান্য সাক্ষী ডাকিয়া সত্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন মহাভারতে কৃষ্ণের জীবনের যে অংশ বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোন পুরাণেই তাহা হয় নাই; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য তুলনা করিয়া সত্য উদ্ধারের যে উপায় আছে এ স্থলে তাহাও নাই।

অতএব, বঙ্কিম বাবুর প্রমাণ মত দেখিতে পাইতেছি, ব্যাসরচিত মূল মহাভারত বর্ত্তমান নাই। এখন যে মহাভারত পাওয়া যায় তাহা ব্যাসের মুখ হইতে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের মুখ হইতে উগ্রশ্রবার পিতা, পিতার মুখ হইতে উগ্রশ্রবা, এবং উগ্রশ্রবার মুখ হইতে অন্য কোন একজন কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এ মহাভারতের মধ্যেও কালক্রমে নানা লোকের রচনা মিশ্রিত হইয়াছে; তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্লিষ্ট করিবার কোন নির্ভরযোগ্য

উপায় আপাততঃ স্থির হয় নাই। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তুলনা দ্বারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবারও পথ নাই।

সুতরাং এখনো বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই চেষ্টাই তাঁহার প্রধান গৌরব। কেবল চেষ্টা নহে; তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়াছেন এবং মনের যে ভাবটি রক্ষা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের শিক্ষাবিধানের পক্ষে মহামূল্য।

এক্ষণে ঐতিহাসিক সমালোচনা শেষ করিয়া সমালোচ্য গ্রন্থ-প্রকাশিত কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

নীতির ধর্ম্ম।

বুদ্ধ চরিত।

যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ এই চিন্তায় উপস্থিত হইলেন, যে বিশুদ্ধ নীতি অবলম্বনই দুঃখ বিনাশের এবং নির্ব্বাণের একমাত্র উপায় তাঁহার চক্ষু হঠাৎ উন্মীলিত হইল। আর তিনি অন্ধকারে রহিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি আলোকে পূর্ণ হইল। আর তাঁহার কোন ভয় রহিল না। এই সেই নির্ব্বাণ যাহা প্রাপ্ত হইলে জীবন্মুক্ত হয়, যাহার প্রশংসা কবিগণ সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা পাইলে দেবতারা পুলকিত হন এবং যাহার আগমনে সমস্ত প্রকৃতি আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। এই সেই নির্ব্বাণ যাহার প্রভাবে সমুদয় চরাচর

বুদ্ধের অধীনস্থ হয় এবং যাহার নির্দ্দেশে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। সিদ্ধার্থ সহসা এই আলোক পাইলেন। ইহা প্রকৃত প্রত্যাদেশ—সচরাচর ইহা লোকে পায় না। সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর ইহার জন্য সাধন করিতেছিলেন। এ রত্ন পাইবার জন্য তিনি সংসার, রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজভবন, প্রিয়তমা পত্নী প্রাণসম পুত্র সকলকে বিসর্জ্জন দিয়া পথে পথে ভিক্ষুক হইয়া বেড়াইতেছিলেন। সামান্য রাজত্ব হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি এখন পৃথিবীপতি হইলেন। *এ কথা অত্যুক্তি হইল না। কেননা যে লোক এত বড় দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলেন, যাঁহার আত্ম বিসর্জ্জন কেবল সংসার লইয়া নয়, রাজত্ব লইয়া নয়, কিন্তু কামনা লইয়া, সে লোক কি সকলের পূজ্য না হইয়া থাকিতে পারেন? ঈদৃশ জনকে লোকে সামান্য অর্ঘ্য দেয় না—মনের সমগ্র কৃতজ্ঞতা, ভক্তি; শ্রদ্ধা, উপাসনা তাঁহার চরণে অর্পিত করে। আমরা একটি সামান্য কামকে মন হইতে তাড়াইতে পারি না, আর তিনি সিংহনাদে পৃথিবীকে বলিতে পারিলেন—"আমার মনে কামরিপু তিল মাত্র স্থান পায় না, এখন কামনাঅগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে!" অনেকে বলেন যে বুদ্ধ এমন সহজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি রূপে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন? ভাল হইলে জন্মের দুঃখ যায় এ কে না জানে? এ আবিষ্ক্রিয়া করিবার জন্য এক জন মহাপুরুষের জন্মাইবার' কি প্রয়োজন ছিল? বিশুদ্ধ মত, বিশুদ্ধ ভাব, বিশুদ্ধ কথা, বিশুদ্ধ কার্য্য, বিশুদ্ধ জীবনোপায়, বিশুদ্ধ চেষ্টা, বিশুদ্ধ স্মৃতি, বিশুদ্ধ চিন্তা - এ সকলেতে নূতন কি আছে? সকলেই ত মানেন যে ভাল কথা কহা উচিত, ভাল মতে জীবনকে চালান উচিত। বাস্তবিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম এত বড় কিসে? পৃথিবীর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে বৌদ্ধ সংখ্যাই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এত লোক কি কেবল "সত্য কথা কহা উচিত", "জীব হিংসা করা উচিত নহে" ঈদৃশ সত্য লইয়া বৌদ্ধ হইয়াছে?

বুদ্ধের যে এত সম্মান এবং তিনি জীবদ্দশায় যে এত শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সহজে বুঝা যায়। একজন রাজপুত্র রাজ্যকামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, ইহাই ত এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। তাহার পর সেই রাজকুমার পথে পথে বিচরণ করিয়া অবশেষে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইহা কি লোমহর্ষণ ব্যাপার নহে? তাহার পর সেই রাজকুমার ঋষিপ্রদর্শিত সকল উপায়কে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ঘোর সাধন দ্বারা এক নূতন পথ, নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন এবং আজীবন আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া সেই ধর্ম্ম নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করিলেন। এমন সুপুরুষ রাজকুমার, সংসারসুখ ত্যাগ করিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় বেড়াইবেন, এ দৃশ্যে কাহার মন না চমকিত হয়? কে না হৃদয়ের ভক্তি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করে? আত্মবিসর্জ্জন ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়। যখন একজন রাজপুরুষ এই আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তখন তাঁহার ধর্ম্ম যে সকলে গ্রহণ করিবে, তাঁহার দৃষ্টান্ত যে সকলে অনুসরণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের জয় বুদ্ধের জীবনেই দেখিতে হইবে। এত বড় ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত ভারত অবহেলা করিতে পারিল না। এতদ্ব্যতীত আর একটি কথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নূতন ধর্ম্ম। ভারত ধর্ম্মপ্রধান দেশ ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এখানে পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ভক্তি, যোগ এই লইয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিয়া একটি পদার্থ সকলেই

মানে, কিন্তু ধর্ম্ম নীতিপ্রধান ইহা তখনকার লোকেরা স্বীকার করিতে চাহিত না। এদেশে কোন লোক অতিশয় ভক্তিতে মত্ত হইতে পারে, অথচ জীবনে নীতি দেখান আবশ্যক, এমন কি জীবনে নীতি না-দেখাইলে ধর্ম্ম হয় না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে নাও পারে। বুদ্ধের সময় যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি লইয়াই ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু তাহাতে নীতির প্রাধান্য ছিল না। ভারতে কোন ধর্ম্ম নীতির সহিত যোগ অনেক দিন রাখিতে পারে না। ইহার প্রমাণ আজও দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ সেই জন্য দেশের অভাব বিবেচনা করিয়া পুরাতন মার্গে গমন না করিয়া একেবারে একটি নূতন পথ বাহির করিলেন। নীতিই ধর্ম্ম এই তাঁহার ধর্ম্মের সার কথা। এবং তিনি যত সাধন ও নিয়ম-প্রণালী স্থাপন করিলেন তাহারও উদ্দেশ্য সেই নীতির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা।

এখন দেখিতে হইবে নীতিধর্ম্মের অর্থ কি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে নীতিধর্ম্ম বলি ইহা তাহা নহে। যে ধর্ম্মে বলে—সত্য কথা কও, মিথ্যা কথা কহিও না, দয়া কর, জীবহত্যা করিও না, এ ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নহে। বাস্তবিক সকল ধর্ম্মেই এই সকল নীতিবিষয়ক আদেশ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল এই প্রকার ধর্ম্ম হইলে অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেদ থাকে না। অথচ প্রত্যেক ধর্ম্ম একটি বিশেষ সত্য, বিশেষ মত, বিশেষ সাধনা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি সকল ধর্ম্মের নীতির অংশটি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাই বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মের নূতনত্ব কোথায় থাকে? নীতিধর্ম্ম দুই প্রকার—এক প্রকার সামান্য ধর্ম্ম, আর এক প্রকার উচ্চ ধর্ম্ম। এ দুইটি স্তরে স্তরে স্থাপিত আছে। প্রায় সকল লোকের এই সামান্য

ধর্ম্মটি থাকিতে পারে ও আছে। কিন্তু উচ্চতর স্তরে দণ্ডায়মান হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দুই ধর্ম্মই পুণ্য লইয়া গঠিত, দুইএতেই পাপের সহিত সংগ্রামের ব্যবস্থা। কিন্তু একটিতে কেবল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম চলিতে থাকে, অথচ পাপ চলিয়া নাও যাইতে পারে। আর একটিতে পাপ একেবারে চলিয়া যায় এবং তাহার পর সংগ্রাম আর থাকে না। আমি একটি ক্ষেত্রে নানা প্রকার বীজ বপন করিয়া দেখিলাম যে কতকগুলি অনিষ্টকর গাছ-গাছড়া তাহাদিগকে বৃক্ষে পরিণত হইতে দিতেছে না। সে স্থলে আমি কি করি? সেই গাছ গাছড়াদিগকে কাটিয়া ফেলি। তাহাতেও কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? সেই গাছগাছড়া মূল লইয়া আছে। সেই মূলগুলিকে বিনাশ না করিলে আমি অভিলষিত ফল পাইব না। সেই জন্য অগ্নি দিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে। দগ্ধ করিলে আর গাছ গাছড়া থাকিবে না, এবং আমার ইচ্ছামতে সুন্দর সুন্দর ফলফুলের বৃক্ষসকল রোপণ করিতে পারিব। মনুষ্যের প্রকৃতি সেইরূপ একটি ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে। আমি কতকগুলি সদনুষ্ঠান করিব মানস করিয়াছি। কিন্তু পাপ আসিয়া আমার কল্পনাকে বিনষ্ট করে। আমি এক এক করিয়া সেই পাপসমূহকে কাটিতে আরম্ভ করি। কিন্তু একটি কাটিতে আর একটি হয়, এবং যতবার কাটি ততবার তাহারা আবার বর্দ্ধিত হইয়া আমার শুভ ইচ্ছাকে বিনাশ করে। আমাদিগের জীবনে এইরূপে ক্রমাগত পাপের সঙ্গে সংগ্রাম চলিতেছে। এ যুদ্ধে আত্মার উপকার হয় বটে। কিন্তু তাহাতে পাপ যায় না, যেহেতু পাপ আমাদিগের স্বভাবে মূল লইয়া আছে।* অতিশয়

* মার্টিন লুথার বলিয়া গিয়াছেন যে মানুষের পাপ ঠিক তাহার শ্মশ্রুর ন্যায়। ইহাকে ক্ষুর দিয়া কাটিয়া ফেল; তাহা আবার হইবে। আমরা যতদিন বাঁচিয়া

পবিত্র হৃদয়েও পাপের সমুদয় বীজ নিহিত আছে। যখন তখন সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ধর্ম্মোন্নতির ব্যতিক্রম করাইয়া দিতে পারে। সেই জন্য ধর্ম্মের সুফল স্থায়ী করিবার জন্য সেই বীজসমূহকে একেবারে দগ্ধ করিয়া দেওয়া চাই। দগ্ধ হইলে আর ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত থাকিবে না। নির্ব্বিরোধে নিরাপদে ধর্ম্মবৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রদান করে। এই যে ধর্ম্ম ইহাকেই নীতির উচ্চধর্ম্ম বলিয়া মানি। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্ম। বুদ্ধ পাপকে বৃক্ষ বলিয়া রূপক না করিয়া অগ্নির সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন। তৃষ্ণা-রূপ অগ্নি মনকে সদা দহন করিতেছে। তাহাকে নাশ করার নামই নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই তাঁহার ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহারই মাহাত্ম্য বৌদ্ধ কবিরা সহস্র স্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, ইহাই মুক্তি। ইহাই একমাত্র শান্তির আবাস। এই নির্ব্বাণ বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লিখেন নাই। এক একটি ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সকল-ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্যজাতির ইতিহাস এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ ইতিহাস আজকাল জগতের একটি বৃহৎ অভাব। ইহা পড়িলে আমরা ধর্ম্মের নিয়ম-সমূহ জানিতে পারিব। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ। মানবজাতির সকল সময়ে এক অভাব থাকে না। যুগে যুগে ইহাদিগের অভাব ভিন্ন হয়। মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে

থাকি ততদিন নাপিতের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। যখন দেখি যে ধর্ম্ম আত্মা ও শরীরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে এবং যখন আরও দেখি যে আত্মা শরীর-গত, তখন শরীর যে সর্ব্বদা আত্মাকে পরাভূত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কথাটি ঠিক।

অগ্রসর হইতেছে ইহা ধর্ম্ম ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। একজন লোকের উন্নতি ধাপে ধাপে উঠে। প্রথমে একটি অভাব দূরীকৃত হইয়া আর একটি অভাব আইসে, তাহা দূরীকৃত হইলে আর একটি আইসে, ক্রমে সে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে স্থান পায়। অবশেষে আমরা সমুদয় জীবনটি অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারি কেমন স্তরের উপর স্তর উঠিয়া সেই ধর্ম্মজীবনটি গঠিত হইয়াছে। একটির উপর আর একটি স্তর যাহা উঠিয়াছে; ঠিক সেইটিই হওয়া উচিত, অন্য কোন স্তর তাহার উপর বসাইলে ঠিক হইত না। সেইরূপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতি স্বাভাবিক ভাবে গঠিত। একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর—অন্য একটি স্তর হইলে তাহা ভুল হইত। বৎসর, যুগ ভাবিলে দেখি যে বৌদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের পূর্ব্বে আসিয়াছিল। তাহার অগ্রে এ দেশে বৈদিক ধর্ম্ম এবং ইহুদি জাতির মধ্যে মুসার ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা মনুষ্যের শৈশবাবস্থার ধর্ম্ম। শৈশব কালের যে স্বভাব যৌবনে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যৌবনকালের পরীক্ষায় শৈশবের নিয়ম খাটে না। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন আসিয়াছিল তখন ভারতবাসীরা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের সেই যৌবনোপযোগী একটি নূতন ধর্ম্ম আবশ্যক হইয়াছিল। যৌবনকালের প্রথমেই কি ধর্ম্ম হওয়া উচিত? আমরা বলি—বৌদ্ধধর্ম্ম। অর্থাৎ কি না, নীতির ধর্ম্ম। আমরা সামান্য ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা উচ্চধর্ম্ম চান, তাঁহাদিগের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথম ধর্ম্মসোপান করিতে হইবে। মন হইতে কামনার অগ্নি নির্ব্বাণ কর, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে পরে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম,প্রভৃতি আবশ্যক হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর ধর্ম্ম, অতএব ইহাকে

ধর্ম্ম বলা যায় না। ধর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাতে মুক্তির পথ নির্ণীত আছে, যাহাতে মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য বর্ণিত আছে, যাহাতে পাপ পুণ্যের প্রভেদ লক্ষিত হয়, যাহাতে বিবেকের অনন্ত অলঙ্ঘনীয় আদেশ সকল বিবৃত আছে, যাহাতে পুরস্কার এবং দণ্ডের বিধি আছে, তাহাকে ধর্ম্ম বলিতেই হইবে। তবে যে বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই, তাহার গভীর তাৎপর্য্য আছে। বুদ্ধ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মকে লইয়া এত সূক্ষ্মবিচার ছিল, তাঁহার স্বরূপ সকল এত চুলচেরা ভাবে বর্ণিত হইত, যে সে ব্রহ্মকে বুঝিতে পারা কি জানা একেবারে অসম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রিয়া-কলাপের ঘোর ঘটা ছিল—এতদূর ছিল যে ধর্ম্মনীতিকে কোনমতে স্পর্শ করিতে পারিত না। বুদ্ধ দেখিলেন যে, এ ব্রহ্মকে লোকে কখন পাইবে না এবং এ ব্রহ্মকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য মনের যে অবস্থা হওয়া উচিত সে অবস্থা না পাইলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। সে অবস্থা পুণ্যের অবস্থা। যে ঘরে ঠাকুর থাকেন সে ঘর ভক্তেরা সদাই পরিষ্কার রাখেন। এমন কি পাদুকা লইয়া সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ। ইহার অর্থ এই যে মনই ব্রহ্মের আবাস স্থান। সেই ঠাকুর ঘর পরিষ্কার না রাখিলে ঠাকুর সেখানে থাকেন না। অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় মনে ব্রহ্মের বাস একেবারে অসম্ভব। সেই জন্য বুদ্ধ মনকে পরিষ্কার করিবার জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি কেবল মাত্র ঘর শুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। ঘর শুদ্ধ করিলে সেই ঘরে কি ঠাকুর বা কোন্ ঠাকুর আসিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি যদি ঠাকুর-বিষয়ক কোন মত চালাইতেন, তাহা হইলে লোকে সেই ঠাকুরের বিচার লইয়া ব্যস্ত হইত, ন্যায়শাস্ত্রের

সাহায্যে সেই ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেই আগ্রহ দেখাইত। তাহা হইলে কিন্তু বুদ্ধের কার্য্য হইত না। তিনি যেন ঠাকুরের বিষয় একেবারে অজ্ঞ, এই ভাবে তিনি কেবল ইহাই বলিতে লাগিলেন—"কামনা নির্ব্বাণ কর, নির্ব্বাণ কর।" তিনি অন্য কোন কথা বলিতে পৃথিবীতে আসেন নাই। নির্ব্বাণ তাঁহার এক মন্ত্র। যৌবনকালে যে সকল বিভীষিকা আছে, ঘোর রিপুর নির্য্যাতন দেখা যায়, পাপের সঙ্গে ক্রমাগত যে সংগ্রাম চলে, তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গেলে অন্য মন্ত্র নিষ্ফল হয়। সেই জন্য আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে যুবকদিগকে নীতির পথে রাখাই সুব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বুদ্ধ ঠিক সেই নির্ব্বাণ-মন্ত্র দিয়া এ দেশকে এবং জগতবাসীদিগকে যৌবনের পাপ ও রিপুপ্রাধান্য হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

উচ্চ ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথম সোপান বলিয়া বোধ হয়। দেখ আমাদিগের দেশে যোগের ধর্ম্মে, ভক্তির ধর্ম্মে পাপ পুণ্যের বিষয়ে অধিক উল্লেখ নাই; বাস্তবিক যে ধর্ম্ম যে সত্যটি বলিতে আসিয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কথা কিছুই বলে না। যোগধর্ম্মে যোগের কথাই পাওয়া যায়, বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তির কথাই প্রধান। অনেকের মনে সংস্কার আছে যে তবে যোগী হইলে কিম্বা ভক্ত হইলে পাপ পুণ্য বিচারের আবশ্যকতা থাকে না। আমরা সেই জন্য যোগীদিগকে অনেক সময় পাপ করিতে দেখি। ঋষিদিগের জীবনে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগের প্রাবল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক যোগ ও ভক্তির ধর্ম্মে পাপ পুণ্য বিচারের স্থান নাই। ইহার অর্থ এই যে যোগে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে পাপের নির্ব্বাণ হওয়া

আবশ্যক। যে কামনাতে মনের চাঞ্চল্য আইসে তাহা নির্ব্বাণ না করিলে মনের একাগ্রতা কিরূপে হইবে? পাপের নির্ব্বাণ হইলে তবে যোগে নিমগ্ন হওয়া যায়, পাপের অনুরক্তি চলিয়া গেলে তবে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। যদি পাপ থাকে তাহা হইলে পদে পদে কুচিন্তা আসিয়া মনকে অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত করে। সেই জন্য মনকে পরিষ্কার করিয়া, ঠাকুর ঘর শুদ্ধ করিয়া তবে যোগেশ্বরকে লইয়া, ভক্তবৎসলকে লইয়া, পূজা আরম্ভ করা সম্ভব। এই কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, নির্ব্বাণের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এবং তাহার পরে ক্রমান্বয়ে যে সকল ধর্ম্ম আসা উচিত তাহারা আসিয়াছে।

ক্ষাত্রচর্য্য।

সকলেই জানেন, জর্ম্মণীতে প্রজাসাধারণকেই সৈন্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হয়। অন্যান্য বিদ্যার সহিত দেশরক্ষা করিবার বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী শিক্ষিত ও প্রস্তুত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণ মাত্রেই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইত, এবং ছাত্র অবস্থা হইতেই তাহার শিক্ষা বিধান চলিতে থাকিত— তেমনি, জর্ম্মনী দেশেও প্রত্যেক জর্ম্মন পাঠাবস্থায় যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করে, যে বিশেষ বিধানে মানুষ হইয়া উঠে তাহাকে ক্ষাত্রচর্য্য নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল, জর্ম্মন বিশ্ববিদ্যালয় সেইরূপ ক্ষাত্রচর্য্যাশ্রম।

ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ছাত্রদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, জর্ম্মণীতে সেরূপ নাই। সেখানে কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ হইয়া থাকে। আহার ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, বক্তৃতাকালে তাহারা উপস্থিত না থাকিলেও তাহাদিগকে শাসনের দ্বারা বাধ্য করা হয় না।

সেখানে ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাধারণতঃ এক এক প্রদেশের ছাত্র মিলিয়া এক এক সম্প্রদায় গঠিত করে। এই সম্প্রদায়গুলিকে বলে Korps কোর্প্‌স্‌।

প্রত্যেক কোর্প্‌সের অধীনে একটি করিয়া পানশালা এবং যুদ্ধশালা আছে। তিনজন কর্ম্মচারী দ্বারা কোর্প্‌সের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রধান কর্ম্মচারী কোর্প্‌স্‌-সভাধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কর্ম্মচারী, সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে যতকিছু দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। এবং যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম পালন সম্বন্ধে তিনিই দায়ী। যদি কোন ছাত্র অপর ছাত্রের দ্বারা যুদ্ধে আহূত হয় তবে এই দ্বিতীয় কর্ম্মচারীকে জানায় এবং তিনি যুদ্ধের স্থান কাল নির্ণয় ও বন্দোবস্ত করেন, এবং নির্দ্দিষ্টকালের বারো ঘণ্টা পূর্ব্বে যুদ্ধার্থীকে সতর্ক করিয়া দেন। তৃতীয় কর্ম্মচারী সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ। সভার কার্য্যবিবরণ রক্ষা করা, চাঁদা আদায় করা, বিল্‌ শোধ করা, চিঠিপত্র লেখা তাহার কাজ।

যাহাতে কোর্প্‌সের প্রত্যেক সভ্য নিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে সভাপতি তজ্জন্য আপনাকে দায়ী জ্ঞান করেন। নূতন সভ্যগণ যাহাতে কোন বিপদে জড়িত না হয় অথবা অলসভাবে কাল যাপন না করে প্রধান সভ্যগণ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ জর্ম্মন সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত। পাঠকগণ বোধ করি সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিয়া থাকিবেন সেখানকার সম্রাট্‌

নিয়ম করিয়াছেন যে কোন সৈনিক কর্ম্মচারী দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি সৈন্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। আহূত হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হওয়া প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের পক্ষেও অত্যন্ত অগৌরবের বিষয় ছিল—জর্ম্মণজাতির মধ্যে সেই ক্ষত্রনীতি প্রচলিত। সুতরাং তাহাদিগকে ছাত্রাবস্থা হইতেই সমাজের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হয়। এই জন্য জর্ম্মন ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথা একটা বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে।

নূতন সভ্যগণ কিরিচ খেলিতে শিখিবামাত্র, বিবাদের কারণ থাক্ বা না থাক্, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রীড়াযুদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়; এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ যুদ্ধে অনুরাগী ও শস্ত্রবিদ্যায় অভ্যস্ত হইতে থাকে। তাহার পর যখন রীতিমত বিবাদমূলক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তখন কোর্প্‌সের নিযুক্ত ডাক্তার ও সভ্যগণের সম্মুখে নীতিরক্ষা পূর্ব্বক যুদ্ধ হইয়া থাকে। পনেরো মিনিট কালের অধিক যুদ্ধের নিয়ম নহে। সেই সময় উত্তীর্ণ হইলেই অথবা গুরুতর আঘাত প্রযুক্ত ডাক্তার থামিতে বলিলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে হয়।

এই কোর্প্‌সের পঞ্চায়তে ন্যায় অন্যায় সম্মান অসম্মানের বিচার হইয়া থাকে। এক কোর্প্‌স্‌ভুক্ত কোন সভ্য যদি অপর সভ্যের প্রতি কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করে তবে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য; যদি অস্বীকার করে তবে তাহাকে অপমানসহকারে কোর্প্‌স্‌ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়; এবং জর্ম্মন্ সাম্রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত প্রত্যেক কোর্প্‌সের সভ্যকে পত্রদ্বারা সেই সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কেহ কোন গর্হিত আচরণে লিপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে দেশের সমস্ত ছাত্রসমাজে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত হয়, কেবল তাহাই নহে, সংসারে প্রবিষ্ট ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের নিকটেও অপরা-

ধীর দুর্ণাম পত্রদ্বারা রাষ্ট্র হইয়া থাকে। এ শাসন বড় সামান্য ব্যাপার নহে।

কোর্পসের সভ্যগণ কেবল যে যুদ্ধ এবং অধ্যয়ন লইয়া থাকে তাহা নহে। তাহাদের প্রমোদ সভাও আছে। সঙ্গীত এই প্রমোদ সভার প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক সভ্যের হাতে একটি করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড গানের বই থাকে, তাহাতে গানের কথা এবং স্বরলিপি প্রকাশিত আছে। জর্ম্মানিতে প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বরলিপি দেখিয়া গান গাওয়া শেখানো হয় এই জন্য এই সকল প্রমোদ সভায় সঙ্গীত নিদারুণ কোলাহলে পরিণত হয় না। কণ্ঠস্বর তরুণ পুরুষোচিত প্রবল, সুরগুলি সহজ এবং প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, গানের কথাগুলি সরল এবং মহৎ,কারণ তাহা বড় বড় কবির কাব্য হইতে নির্ব্বাচিত। কবিতাগুলির ভাব দেশানুরাগ অথবা সখ্যমূলক, মোটের উপরে, জাতিসাধারণের অন্তরের কথা। এই ছাত্রসভার সাম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনিতে হৃদয় কি রূপ মুগ্ধ এবং উর্দ্ধে বহমান হইতে থাকে, তাহা, যাহারা না শুনিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারিবে না। জর্ম্মণদের জীবনযাত্রায় সঙ্গীত একটি প্রধান অঙ্গ। সাধারণের মধ্যে স্বদেশানুরাগ প্রচার করিবার এমন উপায় আর নাই, এবং এমন শান্তি-পূর্ণ বিশুদ্ধ আমোদও আর কিছু হইতে পারে না।

আমরা খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ম্যারিয়ন ক্রফর্ডের গ্রাইফেন্-ষ্টাইন্ গ্রন্থে প্রকাশিত জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ হইতে কিয়দংশ উপরে সংকলিত করিয়া দিলাম। সম্প্রতি বাঙ্গালী ছাত্রদের নীতি-সংশোধনের জন্য নানারূপ সভা এবং চেষ্টা দেখা দিতেছে। এ সময়ে উক্ত বিবরণ আমাদের প্রয়োজনে লাগিতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বক্তৃতাশালা। সাধারণতঃ ছাত্রদের নীতি এবং আচরণ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তৃপক্ষের কোন হাত নাই এবং হাত থাকাও সম্ভব নহে। ছাত্রগণ যদি নিজেরা উদ্যোগ করিয়া দল বন্ধন করে এবং আপনাদিগকে কঠিন নিয়মে বদ্ধ করিতে পারে তবেই তাহাদের স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে। দল বাঁধিবার এবং নিয়মে চলিবার শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন আবশ্যক এমন আর কিছুই নহে। কেবলমাত্র স্বার্থ এবং ভয়ের শাসনই আমাদের নিকট বলবান কিন্তু নিয়মের শাসনে আপনাকে বদ্ধ করিতে শিখি নাই বলিয়া কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান আমাদের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাণের ভয় ত্যাগ করিবার শিক্ষাও মানুষ হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান সাধনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছাত্রদিগকে তলোয়ার খেলিতে দিতে আমাদের রাজা অথবা সমাজ কেহই সম্মত হইবেন না অতএব সে দুরাশা ত্যাগ করিতে হয় তথাপি যখন আমরা য়ুরোপের স্বদেশপ্রিয় নির্ভীক বীরজাতিগণের মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ দেখিয়া মুগ্ধ হই এবং মনে করি কেবল দরখাস্ত লিখিয়া এবং সভা করিয়া আমরা সেই মহত্ত্ব লাভ করিব তখন যেন স্মরণ করি যে, জীবনের প্রতিপদে এবং সমাজের সহস্র প্রথায় তাহারা নির্ভীক হইতে, উদ্যোগী হইতে, মহৎ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য যেমন কঠিন আশ্রম ছিল ক্ষাত্রচর্য্যাও তদপেক্ষা অল্প কঠিন নহে।

গান।

[অনুবাদ।]

(Hark, hark, the lark at heaven's gate sings.—
Cymbeline.)

ঐ শুন সখি স্বর্গতোরণে
    চাতক তুলেছে মধুতান।
সূর্য্যদেবতা পূর্ব্বগগণে
    খুলিয়া দেছেন স্থর-যান।
সরসে কমল-কুসুমপাত্র
    অমল কিরণে ভরিয়াছে ;
তীরেতে অতসী এখনি মাত্র
    কনক নেত্র মেলিয়াছে।
নিখিলের যত মোহিনী সৃষ্টি
    সবারি সঙ্গে তুমিও, প্রাণ,
উঠ—উঠ—
জাগ, মধুমতী, খুল নয়ান!

সমালোচনা।

হাসি ও খেলা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই

আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই ; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই ; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।

ছেলেরা অত্যন্ত মূঢ় অবস্থাতেও কত আনন্দের সহিত ভাষা-শিক্ষা এবং কিরূপ কৌতূহলের সহিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রকৃতি যে নিয়মে যে প্রণালীতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মানুষ তাহার অনুসরণ না করিয়া নিজের পদ্ধতি প্রচার করিতে গিয়া শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের আনন্দময় সুকুমার জীবনে একটা উৎকট উপদ্রব আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক ; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনা শক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে হইবে ; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভাল ভাল চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, এক সঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়-বোধ, কল্পনা শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশু-দিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে ; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।

পাঠশালার শুষ্ক শিক্ষাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রত্যাশা রাখি না। কারণ, অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে, ঔষধ যতই কুস্বাদু, চিকিৎসার পক্ষে তাহা ততই উপযোগী, এবং কঠোর ও অপ্রিয় শিক্ষাই শিশুদের অজ্ঞানবিনাশের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ। অতএব, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নের ভার বিদ্যালয়ের নিষ্ঠুর

কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে রাখিয়া আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙ্গালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্র বাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বইখানি যেমন ভাল বাঁধানো, তেমনি ভাল করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহ গ্রন্থখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। আশা করি, যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে জন্য বাঙ্গালী অভিভাবক মাত্রেই দৃষ্টি রাখিবেন।

এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশুপাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে কিন্তু সে গুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশু হস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শঙ্করাচার্য্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র, ও মোহমুদ্গর, কুলশেখরের মুকুন্দমালা, এবং বিশ্বরূপস্তোত্র বাঙ্গলা পদ্যানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র